৪৬তম বর্ষ ● ২য় সংখ্যা ● এপ্রিল-জুন ২০২৫

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের কথা		
প্রতুল মুখোপাধ্যায় স্মরণে		২
অবহেলিত চতুর্থাংশ	দীপাবলী সেন	৩
বৈজ্ঞানিক বেদ	মীরা নন্দা	৪
মদনমোহন	সমীরকুমার ঘোষ	৭
ফাঁসির সাজা	বোলান গাঙ্গুলী	১১
ঘুমের ইতিবৃত্ত	গৌতম মিস্ত্রী	১৩
মহাকুম্ভ	অনার্য মিত্র	১৫
ভাইরাস	অরুণালোক ভট্টাচার্য	১৬
বিজ্ঞান দিবস	রূপালী গঙ্গোপাধ্যায়	১৯
ধর্ম, জাদু ও বিজ্ঞান	রুণা দাশচৌধুরী	২৩
নদী সংযোগ প্রকল্প	শুভমিতা চৌধুরী ও সুদেষ্ণা ঘোষ	২৬
পরিযায়ী পাখি	প্রদীপ্ত গুপ্তরায়	২৯
বিজ্ঞানের অগ্রগতি	অঞ্জনকুমার সেনশর্মা	৩১
নাস্তিকতা	প্রতাপচন্দ্র দাস	৩২

রেজিস্টার্ড অফিস : বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪

কার্যালয় ঃ খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন বি ৪, এস - ৩, পোঃ- (আর) গোপালপুর নারায়ণপুর কলকাতা- ৭০০১৩৬

ফোন : ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৮৯০২৪১২২৯০/৮৭৭৭০৬৬৪৭২

ওয়েবসাইট:www.utsomanush.com/

ই-মেল: utsamanush1980@gmail.com

ফেসবুক:http://www.facebook.com/utsomanush/

ISSN 0971-5800/RN.37375/80

আমাদের কথা

ধর্ম ও কুসংস্কার যেন জড়াজড়ি করে আছে। বহু আগে লেখা শিবরাম চক্রবর্তী'র 'মানুষের মূল্য' কবিতাগুচ্ছ থেকে কয়েকটি লাইন প্রাসঙ্গিক মনে হল— 'তুচ্ছ মিথ্যা ভাবের ফানুস/মানুষ সৃজেছে ধর্ম, ধর্ম কভু সৃজেনি মানুষ।/ কিন্তু হায় তারো মূল্য আছে—প্রাণ দিয়ে শোধ করা চাই,/মানুষের কোনো মূল্য নাই।'

তীর্থস্থানে পুণ্যার্জন করতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল কত মানুষের তার সঠিক তথ্য অজানা রয়েই গেল। ডিজিটাল ইন্ডিয়াতে আজও হাঁপানি সারাতে প্রতিবছর দেশের নানা প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ জুন মাসের আট তারিখে হায়দরাবাদে ছুটে যান। তাঁদের বিশ্বাস মন্ত্রপূত মাছ গিলে ফেললে নাকি রোগমুক্তি হয়।

কলকাতার গোখেল রোডে ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ার্স-এর স্যার আর এন মুখার্জী হলে উৎস মানুষ-এর দশম বর্ষপূর্তি উদযাপন করা হয়েছিল ১৭ ডিসেম্বর ১৯৮৯-তে। এই উপলক্ষে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তাতে উৎস মানুষ নিয়ে কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী মতামত দেন। অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-এর মোক্ষম উপদেশটি স্মরণীয়—'মানুষ করজোড়ে নতমস্তকে কুঁজো হয়ে থাকবে না। মাথা তুলে দাঁড়াবে। অনেকেই ইতিপূর্বে রুখে দাঁড়িয়েছেন এবং যাঁরা রুখে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের প্রতিভাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে যাওয়া নেহাতই নির্বোধের ব্যাপার হবে।'

আমাদের দেশে বিজ্ঞান গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনা আদান-প্রদানের অন্যতম কেন্দ্র বিজ্ঞান কংগ্রেস, যা আয়োজনের খরচ দিত কেন্দ্রীয় সরকার। এবারে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম আর্থিক সাহায্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। ফলে বিজ্ঞান কংগ্রেস আয়োজন করা যায় নি। অথচ মহাকুম্ভ আয়োজনের খরচ বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার দেয় ২১০০ কোটি টাকা আর আয়োজক রাজ্য দেয় ৫৪৩৬ কোটি টাকা। এর থেকেই বোঝা যায় দেশে বিজ্ঞানচর্চা কতটা কোণঠাসা।

প্রতুল মুখোপাধ্যায়-এর প্রয়াণে উৎস মানুষ অনেকদিনের বন্ধুকে হারালো।

উমা

প্রয়াত প্রতুল মুখোপাধ্যায় (১৯৪২-২০২৫)

পত্রিকার দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্সের সভায় প্রতুলদা উৎস মানুষের পাঠকদের সামনে হাজির হন। এই উপলক্ষে লিখেছিলেন 'উৎস মানুষ' কবিতাটি। *প্রশ্ন কখনও হয় না শেষ।/কি, কেন, কোথায়, কী করে, কখন?/প্রশ্নের ঢেউ ছুটছে।/উৎস থেকে মোহানা, আবার/মোহানা থেকে উৎসে।/ভাঙছে, গড়ছে, ভাবনার পাড়/ ঢেউ ওঠে উত্তাল,/ভেসে যায় ঢেউয়ে ক্লেদাক্ত আর /পচাগলা জঞ্জাল।/মানুষ দিয়েছে সেই ঢেউয়ে পাড়ি/ডুবছে, আবার উঠছে—/উৎস থেকে মোহানা, আবার/ মোহানা থেকে উৎসে।/ চোখে তার জ্বলে জিজ্ঞাসা/হাতে যুক্তির তরবারি,/ভয়েতে পালায় মিথ্যার আর /মৃত্যুর কারবারী।/নির্ভয় রণজয়ী মানুষের/ প্রশ্ন কখনও হয় না শেষ।* অন্য গানের সঙ্গে সেটিও গেয়ে শোনান। ১৯৮৭-র মার্চে কলকাতায় প্রথম বসেছিল 'খোলা মনের মেলা : উৎস মানুষ-এর আড্ডা'। তারপর থেকে প্রতি বছর আড্ডা হত। শুধু কলকাতা নয়, হরিণঘাটা, হালিশহর, শ্রীরামপুর, ক্যানিংয়েও আড্ডার আয়োজন হয়েছে। প্রতুলদা কলকাতার আড্ডায় মাঝে মাঝে আসতেন। ইটভাটার মহিলা শ্রমিক, স্কুলমাস্টার, বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাব-সংগঠন, শিক্ষক, ট্রেনের বই বিক্রেতার পাশাপাশি ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী , অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, প্রাক্তন উপাচার্য সুশীল মুখোপাধ্যায়, প্রযুক্তিবিদ সমর বাগচী, আলোকশিল্পী তাপস সেনের মতো মানুষেরাও তাতে যোগ দিতেন। সেই আড্ডার নিয়মিত সদস্য হয়ে গেলেন প্রতুলদাও। আর প্রতুলদা মানেই তো গান! ক্রমশ উৎস মানুষের একজন হয়ে ওঠেন। ওঁর ছড়া, কবিতা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। উৎস মানুষ প্রকাশনার 'যুক্তিবাদের চার সেনাপতি'-র অধিকাংশ লেখার অনুবাদ করেন। বইটির নামকরণ ও প্রচ্ছদ পরিকল্পনাও ওঁর।

প্রতুলদা বরাবরই প্রতিষ্ঠান বিরোধী। সত্তর দশকের উত্তাল সময়ের রাজনীতির সমর্থক ছিলেন। ওঁর 'জন্মিলে মরিতে হবে রে, জানে গো সবাই', 'লড়াই করো যতদিন না বিজয়ী হও', 'ভয় পাস নে ছেলে', 'চলো হে চলো হে লড়াইয়ের দিকে যাই' ইত্যাদি অসংখ্য গান উদ্বুদ্ধ করত দিনবদলের স্বপ্ন-দেখা ছেলেমেয়েদের। পূর্বতন সরকারের নানা সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে প্রতুলদা হাঁটলেন প্রতিবাদ মিছিলে। জীবনের উপান্তে এসে ওঁর হঠাৎ প্রতিষ্ঠানমুখিতা অনুরাগীদের একেবারেই ভালো লাগে নি। এক বিশেষ দলের সমাবেশে প্রতুলদার উপস্থিতি গুণমুগ্ধদের হতাশ করতে থাকে। ক্রমশ উৎস মানুষ-এর সঙ্গে যোগাযোগ আলগা হয়ে যায়। ২০১১-পূর্ব আর তারপর থেকে আমৃত্যু এক প্রতুলদা দু'ভাগ হলেন। এটা ঘটনা, যাঁরা আখের গোছাতে ক্ষমতাসীন সরকারের তাঁবেদারি করছে, প্রতুলদা কখনই সেই দলে পড়েন না। তবুও। আসলে এমন সৎ, নির্লোভ মানুষকে সবাই দলে টানতে চান। জনপ্রিয় তো ছিলেনই, 'বাংলার গান' গেয়ে প্রতুলদা জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে যান। সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে পেলেন মুষ্টিমেয়র গান স্যালুট। কলকাতায় ওঁর নামে রাস্তাও হল! কিন্তু প্রতুলদার মরদেহ নিয়ে ওঁর গান গাইতে গাইতে হাজার হাজার অনুরাগী ছেলেমেয়েদের শোকমিছিলের চেনা ছবিটা দেখা গেল না! এটা ওঁর প্রাপ্য ছিল না। প্রতুলদার মতো শুভানুধ্যায়ী প্রিয়জনকে হারিয়ে গভীর দুঃখের সঙ্গে অপ্রিয় কথাটা বলতেই হল। **উমা**

অবহেলিত চতুর্থাংশ

দীপাবলী সেন

চার ভাইয়ের মধ্যে একমাত্র শত্রুঘ্নের নামের মধ্যেই আছে বীরোচিত বা ক্ষত্রিয়োচিত ব্যঞ্জনা, তবু রামায়ণে শত্রুঘ্ন একেবারেই যেন পার্শ্ব চরিত্র। নামকরণের মধ্যে ভবিষ্যৎ খুঁজতে যাওয়া হাস্যকর ব্যাপার, সেই মার্কণ্ডেয় পুরাণে মদালসা বলে গেছেন। তবু বরাবরই আমরা নামের ডিনোটেশন ছাড়া একটা কনোটেশন ভেবে নিয়েই নাম রেখে থাকি। রাম প্রসন্নকর, লক্ষ্মণ শুভঙ্কর ও ভরত দায়িত্বশীল হবেন, তেমনি শত্রুঘ্ন করবেন শত্রুহনন। এই প্রত্যাশা।

কিন্তু রামায়ণে শত্রুঘ্ন তাঁর এই ভূমিকাটি তেমন করে পালন করতে পারেন নি, সুযোগের অভাবে। রাম প্রথম থেকেই লক্ষ্মণকে তাঁর জুড়িদার বেছে নিয়েছেন। কেন, তা স্পষ্ট নয়। লক্ষ্মণ ও শত্রঘ্ন তো যমজ? কিন্তু রাম শত্রুঘ্নকে তেমন কাছে টেনে নেন নি।

তাড়কা ও মারীচ বধে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে নাম করার সুযোগ দেন নি। অথচ লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন দুজনের চরিত্রগত মিল ছিল। দুজনেই রগচটা ছিলেন। মারধরে পিছপা ছিলেন না ... লক্ষ্মণ দশরথের আদেশে চটে গিয়ে তাঁকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন। শত্রুঘ্ন মন্থরাকে মেরে আধমরা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু রাম ভরতের মতো শত্রুঘ্নকেও দূরে দূরেই রেখেছেন চোদ্দ বছর ধরে, এবং তারও পরে ...

সীতাকে সবে বনবাস দিয়েছেন, অমনি যমুনা পারের কিছু সন্ন্যাসী রামকে এসে জানালেন, রাক্ষস মধুর ছেলে লবণ খুব উৎপাত করছে, রামকে একবার যেতে হয়...। রাম তখন বনবাস ও লঙ্কাজয়ের পরে কিছু ক্লান্ত। সীতা সম্বন্ধে সন্দিহান অযোধ্যাবাসীদের আবারও ভরতের হাতে রেখে যেতে চান না,...তা ছাড়া এখন তিনি রাজা, অন্যকে দায়িত্ব দেয়ার ভার দিতে বা ডেলিগেট করতে পারেন, ভরতকে পাঠিয়ে দিতে চাইলেন। তখন শত্রুঘ্ন চাইলেন তাঁকেও একটু সুযোগ দেয়া হোক। রাম সঙ্গে সঙ্গে তাঁকেই পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু এটা লক্ষণীয়, পাঠালেন লবণকে মেরে তার জায়গায় বসবার জন্য অভিষিক্ত করে—যেমন করেছিলেন সুগ্রীবকে ও বিভীষণকে। কিভাবে লবণকে মারতে হবে সব বেশ করে শিখিয়ে দিয়ে, মেরে তার জায়গায় নতুন নগর পত্তন করে সেখানে রাজা হয়ে বসতে। শত্রুঘ্ন মাঝে মাঝেই বাড়ি আসতে চেয়েছেন কিন্তু রাম দেন নি। একবার দিলেও ক'দিন বাদেই ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ রাম ছাড়া শত্রুঘ্নও রাজা হয়েছিলেন, মধুর নামেই নগর গড়ে ওঠে মথুরা।

ব্যাকরণ বলে, 'র ল য়ো রভেদঃ'। ল র ও ল উচ্চারণের দিক থেকে খুব কাছাকাছি। রাবণ ও লবণও তাই। রাম যেমন রাবণ বধের কীর্তি অর্জন করেছিলেন, শত্রুঘ্নও যেন অনুরূপ। কিন্তু এর পর তাঁর যেন নির্বাসন হয়ে গেছে—রামের আদেশে। রাম কি শত্রুঘ্নকে একটু ভয় পেতেন? সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ মনে করতেন? তাঁর অনুপস্থিতিতে ভরত-শত্রুঘ্ন বেশ রাজ্য চালিয়েছিলেন। প্রজাশাসন শিখে গিয়েছিলেন! যদি তাঁরা দখল না ছাড়েন?

হনুমানের মাধ্যমে রাম ভরতের মন জেনে নিয়েছিলেন। ওদিক থেকে কোনও থ্রেট আসবে না বুঝে গিয়েছিলেন। কিন্তু শত্রুঘ্ন যদি কোনওদিন অযোধ্যার সিংহাসনের ভার চেয়ে বসে? ওর বরং নিজের একটা কিছু করে নিয়ে দূরে সরে থাকাই ভালো।

উত্তর কাণ্ডে আরো আছে যে, লবণ-বধে যাবার পথে শত্রুঘ্ন বাল্মীকির আশ্রমে এক রাত ছিলেন ও সেই রাতেই উঠেছিল সীতার প্রসব বেদনা। তিনি জানতে পেরেছিলেন রামের তথা অযোধ্যার উত্তরাধিকারী পেয়ে যাবার কথা। সরল মনে তিনি হয়ত রামকে জানাতে চেয়েছিলেন এই আনন্দ সংবাদ। রামের যা এসপিয়োনেজ সিস্টেম, তাতে হয়ত তিনি সে কথা জানতেন। লক্ষ্মণকে তিনি বাল্মীকির আশ্রমের কাছাকাছিই সীতাকে ছেড়ে দিয়ে আসতে বলেছিলেন। তিনি সবে সীতার নির্বাসনটি ঘটিয়েছেন, এখন ছেলে হবার কথা জানাজানি হয়ে গেলে 'পাবলিক' সেটা কিভাবে নেবে, সে ব্যাপারে রামের হয়ত সন্দেহ ছিল। এটাও একটা কারণ হতে পারে, কেন তিনি শত্রুঘ্নকে অযোধ্যা থেকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। শেষের সেদিন অবধি, যখন শত্রুঘ্ন নিজে ছুটে এসেছিলেন। ভরতের মতো তিনিও রাজ্য নয়, রামকেই চেয়েছিলেন। (তাছাড়া বিষ্ণুলোকে তাঁরও দাবি আছে।)

কেনেথ অ্যারো (Kenneth Arrow) তাঁর Arrow Impossibility Theorem-এ প্রমাণ করেছেন যে কোনও সংগঠন পরিচালনা করতে, ডিক্টেটরশিপ বা একনায়কত্বই

(পরবর্তী অংশ ৪ পাতায়)

বৈজ্ঞানিক বেদ — একটি বিক্রয়যোগ্য পণ্য

মীরা নন্দা

''বৈজ্ঞানিক বেদ''-এর ধারণাটি আসলে ''অবিশ্বাস্য ভারত!'' প্রচার অভিযানের অঙ্গ, যা ভারতীয় মান্য ঐতিহ্যকে মূলত বিদেশি পর্যটকদের কাছে বিক্রি করে। তবে যেভাবে এই 'বৈজ্ঞানিক মান্য ঐতিহ্য'কে বানানো এবং বেচা হয় তাতে ভারতীয়রাই নিজেদের ইতিহাসে পর্যটকের ভূমিকায় পর্যবসিত হচ্ছে। এমন একখানা আখ্যান যে ইস্কুলের বাচ্চাদের বিজ্ঞানের ইতিহাস হিসেবে পড়ানো হচ্ছে, সেকথা ভাবলেই আতঙ্কিত হতে হয়।

শিক্ষাদান যে এ উদ্যোগের উদ্দেশ্য নয় সে তো পরিষ্কার। এর উদ্দেশ্য হল ভারতের অতীত নিয়ে 'উৎসব পালন' এবং 'বিশ্বাস ঘোষণা'র মধ্য দিয়ে এক 'পক্ষপাতদুষ্ট পর্ব' তৈরি করা। বাস্তবিক, মান্য ঐতিহ্য প্রস্তুতকারীরা ঠিক সেই কথাটাই খোলাখুলি প্রচার করে।

একটা উদাহরণ। প্রধানমন্ত্রী যখন পুরাণ থেকে গণেশ এবং মহাভারত থেকে কর্ণকে ''সাক্ষ্য'' হিসেবে তুলে এনে প্রমাণ করে দিলেন যে প্রাচীন ভারতে যথাক্রমে প্লাস্টিক সার্জারি আর জিনতত্ত্বর অস্তিত্ব ছিল, তিনি পৌরাণিক জগতে তাঁর ওই অভিযানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন— আমাদের নিজস্ব পটুতা আছে। আমরা আজ চিকিৎসাবিজ্ঞানে নবাগত নই।... চিকিৎসাজগতে আমাদের একটা গর্বের জায়গা আছে। একদা আমাদের নেশন মহৎ ছিল।...আমি এই কথাটা বলতে চাইছি যে একদা আমাদের দেশের [চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চার] এইসব সামর্থ্যগুলো ছিল। এইসব সামর্থ্য আমরা পুনরুদ্ধার করতে পারি।

(http://pmindia.gov.in/en/nesw_updates/text-of-the-prime-minister-shri-naendra-modis-address-at-the-ceremony-held-to-rededicate-sir-h-n-reliance-foundation-hospital-and-research-centre-in-mumbai ?cooment=disable.)

তাঁরা যুক্তি সাজান এইভাবে : ভারতীয়রা এক মহৎ সভ্যতার উত্তরাধিকারী, যে-সভ্যতায় যুক্তিশীল অনুসন্ধানকে মদত দেওয়া হত এবং যা থেকে ক্রমে নানা বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণার উদ্ভব হয়েছিল। আধুনিক বিজ্ঞান সেগুলিকে আজ এতদিন পর 'নতুন করে আবিষ্কার করছে' মাত্র। আমাদের তাই এর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হতে হবে, সেই বৈজ্ঞানিক চেতনাকে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং আবার বিশ্বমানের বিজ্ঞান উৎপাদন করতে হবে।

এখানে তিনটি প্রশ্ন ওঠে। প্রথম প্রশ্নটা গৌরবময় অতীত আর বর্তমান দশা সংক্রান্ত। যদি ধরে নিই যে বিজ্ঞানে আমরা সত্যিই একদা মহান ছিলাম তা থেকে কি এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে আবার আমরা সেই মহত্ত্ব অর্জন করব? অন্য দুটো প্রশ্ন হল : এই মান্য 'বৈজ্ঞানিক' ঐতিহ্যকে কীভাবে খাড়া করা হচ্ছে এবং কীভাবে তাকে যুক্তিসিদ্ধ বলে হাজির করা হচ্ছে। এখানে আমরা ঐতিহ্য-নির্মাতাদের দুটি অতি প্রিয় কৌশলকে বাজিয়ে দেখব। একটি হল বর্তমানবাদ (প্রেজেন্টিজম), অন্যটি হল পক্ষপাতদুষ্টতা। এক এক করে আলোচনা শুরু করা যাক।

বর্তমানবাদ : ''পুনরায়'' মহান হয়ে ওঠার সম্ভাবনাটি দিয়েই শুরু করা যাক।

(৩ পাতার পর)

সবচেয়ে সুষ্ঠু, এমনকি একমাত্র উপায়।

রামের একটা প্রচলিত মানস মূর্তি ভারতবর্ষের অধিরচনা বা সুপারস্ট্রাকচারের অংশ হয়ে আছে। তিনি প্রজারঞ্জক, 'ভক্ত জনপ্রিয়'।

কিন্তু গণতান্ত্রিক তিনি আদৌ ছিলেন কি? দশরথ তবু যা হোক রামের অভিষেকের পরিকল্পনা করার সময় মন্ত্রীদের মত নিয়েছিলেন। শত্রুঘ্নকে লবণ-বধে পাঠিয়ে দেবার সময় ও লবণের জায়গায় আগে থেকেই অভিষিক্ত করে দেবার সময় রাম কোনও মন্ত্রীসভা ডেকেছিলেন কি?

ঔরংজেব না হয়েও চার ভাইয়ের মধ্যে একনায়ক হতে পেরেছিলেন তিনি, ভ্রাতৃপ্রীতি নয়, কূটনীতি দিয়ে। তিনি 'ইস্পাতের মানুষ' না হয়েও একটি 'রামরাজ্য' গড়ে তুলেছিলেন। জনমানসে আলোচনার মাধ্যমে তাঁর জন্য হাজার ফুল ফুটে উঠুক — প্রশ্নে স-কণ্টক। উমা

আমরা যেন ধরেই নিচ্ছি যে প্রাচীন জ্ঞানতন্ত্রর ধারাগুলিকে গৌরবান্বিত করে আমরা বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের বিজ্ঞানীদের মনে সাংস্কৃতিক আত্মপ্রত্যয়ের জোগান দিচ্ছি। আমরা যেন ধরেই নিচ্ছি যে প্রাচীনকালের ও বর্তমানকালের অনুসন্ধানের ধারার মধ্যে ধারাবাহিকতা প্রতিষ্ঠা করতে পারলে আমরা আমাদের বিজ্ঞানচর্চার তথাকথিত 'সহজাত' গুণপণার প্রতি প্রত্যয় অর্জন করব।

কিন্তু প্রাচীনকালের বিজ্ঞানের সঙ্গে —শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের যে কোনো প্রাচীন সভ্যতার বিভিন্ন বিষয়ের বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে — আধুনিক বিজ্ঞানের ধারাবাহিকতার ধারণাটা শুধু অনভিপ্রেত নয়, অনুৎপাদকও বটে। অনভিপ্রেত এই জন্য যে আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভবের মধ্য দিয়ে যে *বিচ্ছেদ* ঘটেছিল তাকে এর দ্বারা অস্বীকার করা হয়। ইউরোপে বিজ্ঞান-বিপ্লব ঘটার পর ষোলো থেকে আঠারো শতকের মধ্যে যে-বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটল তা প্রকৃতিকে অনুধাবনের প্রয়াসে মানুষের যাবতীয় পুরোনো উদ্যোগের থেকে একেবারে আলাদা। যেসব বৈপ্লবিক পরিবর্তন আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মের সঙ্গে জড়িত, সে সম্বন্ধে অধিকাংশ বিজ্ঞান-ইতিহাসবিদ একমত :

১. প্রকৃতিকে গাণিতিক রূপদান। অর্থাৎ প্রাকৃতিক বস্তু এবং ঘটনাগুলিকে গাণিতিক ভাষায় পরিমাণাত্মক রূপ দিয়ে ব্যাখ্যা করার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা। এর জন্য উত্তরোত্তর নিখুঁত মাপনীযন্ত্র ব্যবহার করা হল, যথা ঘড়ি, কম্পাস, থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার ইত্যাদি।

২. প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি তথ্যানুসন্ধানী পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো। আধুনিক যুগের প্রথমদিকে বিজ্ঞানীদের (যাঁদের কুলনায়ক হলেন গ্যালিলিও) হাতে প্রকৃতির এই গাণিতিক রূপদানের প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষাসাধন মারফত সমন্বিত হল।

৩. বিশ্বের একটি যান্ত্রিক চিত্র নির্মাণ, যা প্রাকৃতিক জগতের ক্রিয়াপ্রক্রিয়াগুলিকে কেবল গতিশীল কণার নিরিখেই ব্যাখ্যা করতে চাইল।

৪. কায়িক শ্রমকে অভূতপূর্ব মূল্যদান, যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রশিক্ষিত প্রাকৃতিক দার্শনিকদের সঙ্গে কারিগর ও হস্তশিল্পীদের ব্যবধান কমে গেল।

বহু প্রাচীন সভ্যতার সম্মিলিত অবদানেই যে এ বিপ্লব ঘটল তাতে সন্দেহ নেই —প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা, খ্রিস্টীয় সভ্যতা, ইসলামি সভ্যতা এবং ইসলাম মারফত প্রাচীন বনেদি ভারত ও চীনের সভ্যতা। কিন্তু বিজ্ঞান বিপ্লবের পর নতুন যে-বিজ্ঞান গড়ে উঠল তা প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের পুরোনো যে কোনো ধারা থেকে নিতান্ত আলাদা, যদিও সেইসব ধারা থেকে উপাদান নিয়েই তার উৎপত্তি। গ্রীক-রোমান, ইহুদি-খ্রিস্টীয় ধারা সম্বন্ধেও সেই একই কথা, যদিও এগুলিই হল পাশ্চাত্য সভ্যতার *সাক্ষাৎ* পূর্বপুরুষ। প্রাচীন সভ্যতাগুলির গণিত-ভিত্তিক ও পর্যবেক্ষণ-জাত জ্ঞানভাণ্ডার থেকে কিছু কিছু উপাদান তা গ্রহণ করল বটে, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান প্রাচীন ব্রহ্মাণ্ডকে আর দূরকল্পনাভিত্তিক প্রাচীন যুক্তিশীলতাকে উলটে দিল, গড়ে তুলল ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে এবং 'তাহারি মাঝখানে' মানুষের স্থান বিষয়ক নতুন এক ধারণা। *এ বিপ্লব এতই সামগ্রিক যে হিন্দু, খ্রিস্টীয়, ইসলাম, ইহুদি, বৌদ্ধ, তাওবাদী, সর্বপ্রাণবাদী কোনো প্রাক্-আধুনিক জ্ঞানতান্ত্রিক ঐতিহ্যর পক্ষেই আধুনিক বিজ্ঞানীদের তোলা প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না। ও কথাটা তোলাই যুক্তিশাস্ত্রের একটা ব্যত্যয়।* একথা অবশ্যই ঠিক যে প্রকৃতি তার স্বভাব বদলায়নি, তার সংগঠন, তার ক্রিয়াকর্মর নিয়ন্তা মৌলিক নিয়মগুলি বদলায়নি; কিন্তু আগে যেসব ধারণার বর্গে তাদের বসানো হত, তার পদ্ধতিতান্ত্রিক মাপকাঠিগুলো, অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াগুলি সবই মৌলিকভাবে বদলে গেছে। তাই প্রাচীনকালের বাসিন্দা আর আধুনিক বিজ্ঞানীদের বাস কার্যত দুই আলাদা বিশ্বে।

আধুনিক বিজ্ঞানের এই জন্মবৃত্তান্ত স্বীকার করে নিলে, এই ভাবনাটাই সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ে যে, যেসব প্রশ্নের উদয় হয়েছে সবে গত পাঁচশো বছরে তাদের উত্তর আগে থেকেই প্রাচীনরা জানতেন। বলা বাহুল্য, অভিজ্ঞতালব্ধ কিছু কিছু প্রাচীন জ্ঞানের টুকরো আধুনিক জ্ঞানভাণ্ডারে অবশ্যই যুক্ত হতে পারে। তবে তার শর্ত হল, 'বৈজ্ঞানিক' বলে বিবেচিত হতে হলে অভিজ্ঞতালব্ধ যে কোনো দাবিকেই কঠোর পরীক্ষার ছাঁকনি পার হয়ে আসতে হয়, তাদেরও সেসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। উপযোগী ভেষজ উদ্ভিদ, কৃষিকাজের জৈব পদ্ধতি, এগুলি হল সেই ধরনের জ্ঞানের উদাহরণ। কিন্তু তার বাইরে যদি কেউ এরকম দাবি করে যে আধুনিক বিজ্ঞান কেবল প্রাচীনদের জানা জ্ঞানেরই পুনরাবৃত্তি করছে মাত্র, সেটা গালভরা কথা ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রাচীন আর আধুনিক বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে ছেদহীন ধারাবাহিকতার ওপর জোর দেওয়াটা অনভিপ্রেত তো বটেই, উপরন্তু একেবারেই নিষ্ফল। যা কিছু জানার আছে সেসবই আমরা আগে থেকেই জানতাম, যা কিছু আমাদের জানা ছিল সেসবই আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, কোনো কিছুই প্রত্যাখ্যাত হয়নি—এই প্রত্যয়টাই আমাদের সত্যিকারের অনুসন্ধান করার মনোভাব গড়ে তোলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৈদিক বিশ্বদর্শনের মূলাধারের সঙ্গে যেভাবেই হোক

সামঞ্জস্য বজায় রাখার বাধ্যবাধকতাই অতীতে বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছিল; এখনো যদি ওই পথ ধরে চলি তাহলে ভবিষ্যতেও করবে।

''আমি জানি না''—এই মহাকাব্যই তো জ্ঞান অর্জনের প্রথম ধাপ। ইয়ুভাল হারারি তাঁর প্রভাবশালী *সেপিয়েন্স* বইতে একথাটা খুব সুন্দর করে বলেছেন —

> বিজ্ঞান বিপ্লবের বিপ্লবটা জ্ঞানের ক্ষেত্রে ঘটেনি।...ঘটেছিল অজ্ঞতার ক্ষেত্রে। যে-মস্ত আবিষ্কারটা বিজ্ঞান-বিপ্লবকে চালু করে দিল সেটা হল, মানুষ তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর উত্তর জানে না।...আরও সমালোচনাত্মকভাবে দেখলে, আধুনিক বিজ্ঞান স্বীকার করে যে যা কিছু আমরা জানি সেসবই জ্ঞানের আরও প্রসার ঘটলে ভুল প্রমাণিত হতে পারে। কোনো ধ্যানধারণা, কোনো ভাবনা বা তত্ত্বই প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়।

এই কথাটা মেনে নেওয়ার ফলেই ইউরোপে আধুনিক যুগের প্রথম পর্বে, অর্থাৎ ষোলো থেকে আঠেরো শতকের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠেছিল। জ্ঞান আর ক্ষমতা অর্জনের জন্য ধর্মতত্ত্বকে বিসর্জন দেওয়ার মনোভাবই শুধু নয়, অভিজ্ঞতাবাদের সপক্ষে নানাবিধ ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, রাজনৈতিক আর বাণিজ্যিক স্বার্থ, আমূল নতুন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন আর সেই সঙ্গে কায়িক শ্রমের প্রতি এক ধরনের সম্ভ্রম—এই সবকিছুর একত্র সম্মিলন পশ্চিম ইউরোপে বিজ্ঞান-বিপ্লবের রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়েছিল।

এই প্রক্রিয়াটা মোটেই মসৃণ ছিল না। চার্চ আর আরিস্টটল-পন্থী অধ্যাপকদের তরফ থেকে প্রতিরোধ এসেছিল। তাঁরাই তো মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চালাতেন। তবু ঘটনাক্রমে একটা চেতনা জেগে উঠল যে গ্রীক দার্শনিকদের আর বাইবেলের সিদ্ধান্তগুলো ভুল, কারণ তারা প্রণালীবদ্ধভাবে এবং উত্তরোত্তর নিখুঁতভাবে পরিচালিত পরীক্ষানিরীক্ষা মারফত সংগৃহীত সাক্ষ্যগুলিকে ব্যাখ্যা করতে অক্ষম। গ্রীকদের ভূকেন্দ্রিক ব্রহ্মাণ্ড, অসুখের রস-ভিত্তিক তত্ত্ব, পতনশীল বস্তু সম্পর্কে আরিস্টটলের তত্ত্ব এবং বাইবেল কথিত সাত দিনে সৃষ্টির তত্ত্ব, মহাপ্লাবন তত্ত্ব, সবই ভুল বলে প্রমাণিত হল। অথচ ওই সময়কার কোপার্নিকাস, ভেসালিয়াস, নিউটন, এমনকী পরের পর্বের ডারউইন প্রমুখ পথপ্রদর্শকরা সকলেই ছিলেন ভক্ত খ্রিস্টান। এঁরা প্রত্যেকেই কিছু পরিমাণে গ্রীক দর্শন থেকে আর বাইবেল থেকে আহরিত ঐতিহ্যসম্মত মধ্যযুগীয় বিশ্ববীক্ষার আওতার মধ্য থেকেই কাজ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা এমন একটা প্রক্রিয়া চালু করে দিতে সমর্থ হলেন যা শেষ পর্যন্ত উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ওই কাঠামোটাকেই *উলটে ফেলে দিল*।

তার চেয়েও বড়ো কথা হল, ধর্মের বাধা সত্ত্বেও বিজ্ঞান-বিপ্লবীরা কিন্তু ঐতিহ্যের প্রবল চাপের মুখে নিজেদের তত্ত্ব আর পদ্ধতিগুলোকে আরিস্টটল আর বাইবেল-নির্ধারিত তত্ত্ব আর পদ্ধতির সঙ্গে ''সামঞ্জস্যপূর্ণ'' করে তোলার চেষ্টা করলেন না। কোপার্নিকাসের সূর্য-কেন্দ্রিক ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্বকে টলেমির প্রাচীন ভূকেন্দ্রিক ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্বের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হল না। ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বকেও বাঁকিয়েচুরিয়ে বাইবেলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপ দেওয়া হল না। ধর্মীয় মহল প্রথম দিকে যতই হম্বিতম্বি করুক, অবশেষে ঐতিহ্যবাহী শিবিরকেই সাক্ষ্যপ্রমাণের শক্তির কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। আদিযুগের প্রকৃতি বিষয়ক বিজ্ঞানীদের আধিদৈবিক দূরকল্পনাগুলিকে শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করতে হল নিখুঁত মাপজোক আর পারিমাণিক রূপদানের পরীক্ষাভিত্তিক পদ্ধতির কাছে।

কিন্তু ভারতে তা হয়নি। চৈতন্য বা আত্মাই আদি—এই বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গির মূলে আঘাত করতে চাইল যেসব ভাবনা, ঐতিহ্যপন্থীদের শক্তি যেভাবেই হোক তাকে কবজা করে নিতে কিংবা পোষ মানাতে সক্ষম হল। ভারতে বিজ্ঞানের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত প্রচুর যেখানে উন্নত মনের মানুষরা নিজেরাই নিজেদের ভাবনাকে খর্ব করেছেন। যেমন ধরা যাক, 'সিদ্ধান্তে' যখনই পুরাণের সঙ্গে গাণিতিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে বলে মনে হয়েছে সেখানেই আমাদের অনেক প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী পুরাণকেই শিরোধার্য করে 'সিদ্ধান্ত'কে খাটো করেছেন। সপ্তম শতকে ব্রহ্মগুপ্ত এর দুঃখজনক উদাহরণ। তিনি আর্যভট্টর গ্রহণ-তত্ত্বর বিরোধিতা করেছিলেন রাহু আর কেতুর কথা বলে। বিরোধী যুক্তিতর্কর সম্মুখীন হলে আমাদের বিদ্বানরা নিজেরা যেটাকে সত্য বলে জেনেছেন, যার সপক্ষে রয়েছে উন্নততর সাক্ষ্যপ্রমাণ, তার হয়ে রুখে দাঁড়াতেন না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা বেদ আর উপনিষদের চিরন্তন সত্যগুলির সামনে নতজানু হতেন। আচার অনুষ্ঠানের নিয়মকানুন, সামাজিক অভ্যাস আর বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে রক্ষণশীলতা আর মানিয়ে চলার মনোভাব এত গভীরে শক্তিশালী শিকড় গেড়েছিল যে আমাদের বিদ্বান মানুষদের কখনো গ্যালিলিওর মতো ধর্ম-আদালত ডেকে পাঠানোর দরকার হয়নি — তাঁরা নিজে থেকেই নিজেদের জানা সত্যকে অস্বীকার করতে এগিয়ে এসেছিলেন। **(চলবে)**

ভাষান্তর ঃ আশীষ লাহিড়ী **উমা**

বাঙালি মেয়েরাও মদনমোহনকে ভুলে গেল!

সমীরকুমার ঘোষ

এখন বাঙালি 'এ ফর অ্যাপল, বি ফর বল' দিয়ে পাঠ শুরু করে। কিন্তু কয়েক দশক আগেও সব বাঙালি শিশুর কচি কণ্ঠের কাকলিতে ধ্বনিত হত, 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল'। পাখিরা রাতের অন্ধকার পেরিয়ে ঘুমভাঙানিয়া আলোর বার্তা আনে। কবিতার ছন্দ ও বাণী বাঙালি ছেলেমেয়েদের শিক্ষার আলোকপথে নিয়ে যায়। বিদ্যাসাগর মশাই বর্ণপরিচয় ঘটান বটে, তবে শিশুমন অধিকার করে বসেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মদনমোহনকে নিয়ে আলোচনায় আক্ষেপ করেন, 'ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাংলা দেশে যে কয় জন কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, মদনমোহনের স্থান তাঁহাদের মধ্যে প্রায় পুরোভাগে ছিল। কিন্তু বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিয়া তিনি তাঁহার কবি-সম্মান নিজেই বর্জ্জন করিয়াছেন এবং বাংলা দেশও এক জন সত্যকার কবিকে হারাইয়াছে। তাঁহার কবি-প্রতিভার যেটুকু পরিচয় ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া আছে, তাহা দেখিয়া আজ আমরা আক্ষেপ মাত্র করিতে পারি।' এরপর তিনি বলছেন, 'শিশুশিক্ষা'য় তাঁর দান কোন দিন অস্বীকৃত হইবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃতিত্বের সহিত মদনমোহনের কৃতিত্ব বহুস্থলে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার জীবনী-আলোচনায় আমরা 'বাসবদত্তা'র কবি মদনমোহনকে বারংবার স্মরণ করিতেছি।'

আমরা অবশ্য কবি মদনমোহন নন, স্ত্রীশিক্ষার জন্য প্রাণপাত করা মদনমোহনকে নিয়ে দু-চার কথা আলোচনা করব। সুযোগ্য পণ্ডিতরা ওঁর কাজ নিয়ে অনেক বেশি আলোকপাত করলে, বাঙালি মেয়েরা অন্তত একবার কৃতজ্ঞতাবশত ওঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলে, এই আলোচনা সার্থক হবে।

ঈশ্বর গুপ্ত যখন লিখেছিলেন, 'যত দুধের শিশু, ভজে ইশু/ ডুবে মোলো ডবের টবে।/আগে মেয়েগুলো, ছিল ভালো/ব্রত ধর্ম করতো সবে।/একা 'বেথুন' এসে শেষ করেছে/আর কি তাদের তেমন পাবে?/যত ছুঁড়িগুলো, তুড়ি মেরে/কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।/এরা ''এ,বি'' শিখে, বিবি সেজে,/বিলাতি বোল কবেই কবে।' তখন আমরা গুপ্তকবিকে নারীবিদ্বেষী বলে দেগে দিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর আশঙ্কা অংশত বাস্তবে প্রতিফলিত। যে নারীশিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর বা মদনমোহনরা প্রাণপাত করেছিলেন, সেই নারীরা এখন অনেকানেক শিক্ষিত হয়ে তাঁদের ভুলেই মেরে দিয়েছে! কলেজ, রাস্তা, মাথায় কাকপক্ষীর পুরীষপ্রলেপিত মূর্তির দৌলতে বিদ্যাসাগরের নাম জানলেও মদনমোহনের নাম তারা শুনেছে কি না, তা নিয়ে ঘোর সংশয় রয়েছে। আমাদের শিক্ষাকর্তারা পাঠ্যক্রম থেকে তাঁর ওই সব সেকেলে কবিতা তো কবেই বিদায় দিয়েছেন!

১৮৪৯ সালে কলকাতায় ভারত-হিতৈষী ড্রিঙ্কওয়াটার বিটন ওরফে বেথুন হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। যেটি এখন বিটন বা বেথুন কলেজ। আগে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের প্রকাশ্য স্কুলে গিয়ে শিক্ষালাভে অনেক বাধাবিপত্তি ছিল। মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে গুরুজনদের অমান্য করবে, উচ্ছন্নে যাবে, বিধবা হবে ইত্যাদি বহু কুসংস্কার ছিল। এগুলো উড়িয়ে মেয়েদের লেখাপড়া করানো সহজ কাজ ছিল না। অল্প কয়েকজন শিক্ষিত, দুঃসাহসী মানুষের চেষ্টায় এই বাধা দূর হয়। তাঁরা নিজেদের মেয়েদের বিটন নারী বিদ্যালয়ে পাঠাতে থাকেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্ত্রীশিক্ষার ঘোর পক্ষপাতী ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম নিজের দুই মেয়ে—ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে বিটন নারী বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে রীতিমতো দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। তার ফলে তাঁকে নানা সামাজিক নিগ্রহের মধ্যে পড়তে হয়েছিল, সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মচরিতে লিখছেন —'বিটন স্কুল যখন প্রথম স্থাপিত হয়, তখন আপনার কন্যাকে উক্ত বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করাইয়া এবং অন্যান্য প্রকারে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তাররূপ মহৎ কার্য্যে বিটন সাহেবকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বিটন সাহেব এজন্য তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন এবং ''My dear Madan'' (প্রিয় মদন) বলিয়া পত্র লিখিতেন। ইনি ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ''সর্ব্বশুভকরী'' নামে পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকাতে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে একটী প্রস্তাব তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক ঐরূপ উৎকৃষ্ট প্রস্তাব অদ্যাপি বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয় বিল্বগ্রামের একজন ভট্টাচার্য্য হইয়া সমাজসংস্কার কার্য্যে যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি সহস্র সাধুবাদের উপযুক্ত।'

যে 'সর্ব্বশুভকরী' পত্রিকাটির কথা রাজনারায়ণ উল্লেখ

করেন, তার প্রথম সংখ্যাতেই মদনমোহন বাল্যবিবাহের দোষ কী, তাই নিয়ে লিখেছিলেন। সমাজের একাংশে ওঁর লেখার কদর ছিল। বিদ্যাসাগরের ভাই শম্ভুচন্দ্র ন্যায়রত্ন লিখেছিলেন, 'তাঁহার লিখিত বলিয়া, তৎকালীন কৃতবিদ্য লোকমাত্রেই সমাদরপূর্ব্বক সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা পাঠ করিতেন।' পরের মাসে মদনমোহন স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ লেখেন।

বাহির শিমুলিয়ায় দক্ষিণাচরণ মুখোপাধ্যায়ের যে বৈঠকখানা ছিল, তার বাগানের মাঝে প্রশস্ত রম্য গৃহে বিটনের স্কুল চালু হয়। ৭ মে ১৮৪৯ হিন্দুগরের বালিকারা স্কুলে যেতে শুরু করে। বাগানের দক্ষিণ দিকে একটি দরজা ছিল। সেইখানে প্রহরী থাকায় স্কুলে স্ত্রীলোক ভিন্ন অন্য কেউ ঢুকতে পারত না। সংবাদ ভাস্কর, ১০মে ১৮৪৯ দক্ষিণারঞ্জনকে ধন্যবাদ দিয়ে লিখেছিল, যে জায়গাটি তিনি স্কুল চালানোর জন্য দিয়েছিলেন, তৎকালে তার ভাড়া ছিল ১০০ টাকা। কিন্তু তিনি এমনিই দিয়েছিলেন। এছাড়াও বিদ্যাগার তৈরির জন্য এক হাজার টাকা এবং বইপত্রের জন্য পাঁচ হাজার টাকা দেন। হেদুয়া পুষ্করিণীর পশ্চিম দিকে স্কুল, শিক্ষয়িত্রীদের থাকার জায়গা, দারোয়ান-ভৃত্য প্রমুখের জায়গা ইত্যাদি সব মিলিয়ে ৮৪ হাজার টাকা খরচ করেন।

স্কুল হল, কয়েকজনের উৎসাহে কিছু ছাত্রীও হল। কিন্তু সমস্যা হল, তারা পড়বে কি! সেই সময় বাংলায় শিশুদের পড়ার মতো তেমন বই ছিল না। অগত্যা সেই কাজে হাত লাগালেন মদনমোহন। তাতেই শিশুশিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়, যথাক্রমে ১৮৪৯ ও ৫০ সালে। বইটি তিনি বিটন সাহেবকে উৎসর্গ করলেন।

শিশুশিক্ষা বই প্রকাশ মাত্রেই তুমুল জনপ্রিয় হয়েছিল। তার একটি কবিতা তো চিরকালীন হয়ে ওঠে—

'পাখী সব করে রব, রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুমকলি, সকলি ফুটিল।।
রাখাল গরুর পাল, লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন, নিজ নিজ পাঠে।।
ফুটিল মালতি ফুল, সৌরভ ছুটিল।
পরিমল লোভে রবি, আসিয়া জুটিল।।
গগনে উঠিল রবি, লোহিত বরণ।
আলোক পাইয়া লোক, পুলকিত মন।।
শীতল বাতাস বয়, জুড়ায় শরীর।
পাতায় পাতায় পড়ে, নিশির শিশির।।
উঠ শিশু, মুখ ধোও, পর নিজ বেশ।
আপন পাঠেতে মন, করহ নিবেশ।।'

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশের পরের বছরই তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। মুখবন্ধের তারিখ ছিল ১৬ ভাদ্র ১৭৭২ শকাব্দ। মুখবন্ধে লেখা হয়েছিল—'শিশুশিক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে বর্ণ পরিচয়ের উপায় ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে তৃতীয় ভাগে অতি ঋজু ভাষায় নীতিগর্ভ নানাবিষয়ক প্রস্তাব সকল সঙ্কলিত হইল।'

এই নীতিগর্ভ বিষয় নিয়ে লেখার মধ্যে আরেক মদনমোহনকে আবিষ্কার করা যায়, যিনি শিশুদের মনে উদ্ভট কুসংস্কার ঢুকিয়ে দিতে চান না। তাঁদের যুক্তিনিষ্ঠ পাঠ দিতে চান। তাঁর যুক্তি ছিল— 'কেবল মনোরঞ্জনের নিমিত্ত শিশুগণের উন্মেযোন্মুখ চিত্তে কোন প্রকার কুসংস্কার সঞ্চারিত করা আমাদিগের অভিপ্রায় নহে। এ নিমিত্ত হংসীর স্বর্ণডিম্ব প্রসব, শৃগাল ও সারসের পরস্পর পরিহাস নিমন্ত্রণ, ব্যাঘ্রের গৃহদ্বারে বৃহৎ পাকস্থলী ও কাষ্ঠভাবে দর্শনে ভয়ে বলীবর্দ্ধের পলায়ন, পুরস্কার লোভে বক কর্তৃক বৃকের কণ্ঠবিদ্ধ অস্তিখণ্ড বহিষ্করণ, ধূর্ত্ত শৃগালের কপট স্তবে মুগ্ধ হইয়া কাকের স্বীয় মধুর স্বর পরিচয় দান প্রভৃতি অসম্বন্ধ অবাস্তবিক বিষয় সকল প্রস্তাবিত না করিয়া সুসম্বন্ধ নীতিগর্ভ আখ্যান সকল সম্বন্ধ করা গেল।'

কলকাতা মহানগরী, বারাসত ও অন্য বেশ কিছু জায়গায় স্কুল তৈরি হয়েছিল। মদনমোহন নিজের দুই মেয়েকে বেথুনের স্কুলে ভর্তি করেছিলেন, তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। ওঁর দেখাদেখি হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত, সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ব্যাকরণের অধ্যাপক পণ্ডিতবর তারানাথ তর্কবাচস্পতির মতো সমাজের নামীদামি কিছু ব্যক্তি নিজেদের মেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, যাতে তাঁদের দেখে উদ্দীপ্ত হয়ে সমস্ত ভদ্র ব্যক্তিই তাঁদের মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য পাঠান। কিন্তু এক বছর কেটে গেলেও সাধারণের মধ্যে এ নিয়ে উৎসাহ না দেখা দেওয়ায় হতাশ মদনমোহন লিখছেন, 'কিন্তু কি দুঃখের বিষয় অদ্যাপি কেহই এই শ্রেয়স্কর বিষয়ে কিছুই উদ্যোগ করিতেছেন না। সকলেই কুসংস্কার ও ভ্রান্তি জালে মুগ্ধ ও ভ্রান্ত হইয়া স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ের ভাবি উপাদেয় ফল বোধগম্য করিতে পারিতেছেন না, কেবল কুসংস্কারমূলক কতকগুলিন কুতর্ক ও অকিঞ্চিৎকর আপত্তি উপস্থাপিত করিয়া এই মঙ্গল ব্যাপারের প্রতিবন্ধকতাচারণ করিতেছেন।'

স্ত্রীশিক্ষার বিপক্ষ শিবিরের পাঁচটি যুক্তি, বলা ভালো কুযুক্তি মদনমোহন তুলে ধরেন এবং তা পরিখণ্ডন করেন। সেগুলি ছিল— প্রথম। শিক্ষা কর্ম্মের উপযোগিনী যে সকল মানসিক শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির আবশ্যক স্ত্রীজাতির তাহা নাই সুতরাং কন্যাসন্তানেরা শিখিতে পারে না। দ্বিতীয়। স্ত্রীজাতির

বিদ্যাশিক্ষার ব্যবহার এদেশে কখন নাই, এবং শাস্ত্রেও প্রতিষিদ্ধ আছে; অতএব লোকাচারবিরুদ্ধ ও শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ ব্যাপার কদাচ অনুষ্ঠানযোগ্য হইতে পারে না। তৃতীয়। স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষা করিলে দুর্ভাগ্য দুঃখ ও পতি-বিয়োগ দুঃখের ভাজন হইয়া চিরকাল কষ্টে জীবনযাপন করিবেক অতএব এতাদৃশ দৃষ্টদোষদূষিত বিষয় জানিয়ে শুনিয়া পিতা মাতা কেমন করিয়া প্রাণসমান স্বসন্তানকে এই দারুণ দুঃখার্ণবে নিক্ষিপ্ত করিতে পারেন। চতুর্থ। স্ত্রীজাতি বিদ্যাবতী হইলে স্বেচ্ছাচারিণী ও মুখরা হইবেক। বিদ্যার অহঙ্কারে মত্ত হইয়া পিতা মাতা ভর্ত্তা প্রভৃতি গুরুজনকে অবজ্ঞা করিবেক, এবং পরিশেষে দুশ্চরিত্রা হইয়া স্বয়ং পতিত হইবেক এবং স্বকীয় পবিত্র কূলকে পাতিত করিবেক; অতএব স্ত্রীজাতিকে সর্ব্বথা অজ্ঞানান্ধ-কূপে নিক্ষিপ্ত রাখাই উচিত, কদাপি জ্ঞানপথের সোপান প্রদর্শন করা উচিত নয়। পঞ্চম। এই সমস্ত দৃষ্ট ও অদৃষ্ট দোষ উল্লঙ্ঘন করিয়াও যদ্যপি স্ত্রীজাতিকে বিদ্যাশিক্ষা প্রদান করা যায়, তাহাতেই বা ফল কি? ইহারা চাকরী করিতে পারিবেক না, আদালতে গতায়াত করিয়া কোন রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেক না, কোন সাহেব শুভার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে পারিবেক না, এবং হাট বাজারে বসিয়া বা কোন দেশ দেশান্তরে গমন করিয়া বাণিজ্য কার্য্যও সম্পন্ন করিতে পারিবেক না; কুলের কামিনী অন্তঃপুরে বাস করে তাহার বিদ্যাশিক্ষায় কিছুই ইষ্টাপত্তি নাই। প্রত্যুত অনিষ্ট ঘটনার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

এই প্রত্যেকটি আপত্তি সশ্লেষ যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করে মদনমোহন লিখছেন—

প্রথম আপত্তির প্রত্যুত্তর দিবার পূর্ব্বে আমরা আপত্তিকারক মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, স্ত্রীজাতি যে বিদ্যাশিক্ষা করিতে সমর্থ নয় এরূপ সংস্কার তাঁহারা কি মূল হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন? আর কোথায় বা এমত দৃষ্টান্ত উপলব্ধি করিয়াছেন যে স্ত্রীজাতিরা যথা নিয়মে বিদ্যাভাসে প্রবৃত্তি হইয়াছিল, শিক্ষা উপকরণ সমুদায় উপস্থিত ছিল, বিচক্ষণ উপদেশক যথানিয়মে উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ফল দর্শে নাই, স্ত্রীগণেরা সকলেই মূর্খ হইয়াছিল। বোধকরি আপত্তিকারক মহাশয়েরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন না, এবং কোথাও এতাদৃশ উদাহরণ দেখাইতে পারিবেন না। অতএব তাঁহাদিগের এই আপত্তি কেবল অমূলক কল্পনা দ্বারা উদ্ভাবিত মাত্র। ভাল তাঁহারা একবার পক্ষপাতশূন্য চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখুন না কেন, স্ত্রীজাতিরা কেনই বা শিখিতে পারিবেক না। তাহারা কি মানুষ নয়? সচেতন জীবমধ্যে পরিগণিত নয়? তাহাদের কি বুদ্ধিবৃত্তি নাই? মেধা নাই? তর্কশক্তি নাই? সদৃশানুভূতি নাই? কেন! আমরা তো ভূয়োভূয় দর্শন করিতেছি শিক্ষাকার্য্যের উপযোগিনী যে যে শক্তিমত্তার আবশ্যক, স্ত্রীজাতির সে সমুদায়ই আছে কোন অংশের ন্যূনতা নাই; বরং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের কোন কোন বুদ্ধিবৃত্তির আধিক্যই দেখিতে পাওয়া যায়।...

স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাস, ব্যবহার ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া যে আপত্তি উত্থাপিত করেন ইহা কেবল অবহুজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতা নিবন্ধন, সন্দেহ নাই। কারণ আমরা অতি প্রাচীন কালের ইতিহাস গ্রন্থে দেখিতে পাই, ভারতবর্ষীয় কামিনীগণেরা নানাবিধ বিদ্যার আলোচনা করিতেছেন। মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্যা আত্রেয়ী গুরুসন্নিধানে পাঠানুশীলের প্রত্যুহ দর্শন করিয়া জনস্থানস্থিত ভগবান অগস্ত্যঋষির পুণ্যাশ্রমে পাঠার্থিনী হইয়া উপস্থিত হইতেছেন। ভগবান্ ব্রহ্মবিদ্বান যাজ্ঞবল্ক্য গার্গী ও মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দান করিতেছেন। বিদর্ভরাজনন্দিনী গুণবতী রুক্মিণী শিশুপালের সহিত পাণিগ্রহণরূপ অনিষ্টাপাত দর্শন করিয়া স্বহস্তে সাঙ্কেতিক পত্র লিখিয়া দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিতেছেন। উদয়নাচার্য্যের নন্দিনী সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শিনী লীলাবতী শঙ্করাচার্য্যের দিগ্বিজয় প্রস্তাবে স্বভর্ত্তা মণ্ডনমিশ্রের সহিত আচার্য্যের বিচারকালে মধ্যস্থতাবলম্বন ও মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ সমর্থন করিতেছেন। বোধ করি সকলেই জ্ঞাত আছেন, কর্ণাটকরাজমহিষী ও মহাকবি কালিদাসপত্নী এবং বাণভটদুহিতা অতিশয় পণ্ডিতা ছিলেন। আর বিশ্বদেবী গঙ্গাবাক্যাবলী নামে এক ধর্ম্মশাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করিয়া চিরন্তনী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। খনা জ্যোতিষশাস্ত্রে এমত পণ্ডিতা হইয়াছিলেন যে তাঁহার নিবদ্ধ বচন সকল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে প্রমাণরূপে পরিগণিত হইয়াছে। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি আপত্তিকারক মহাশয়েরাও ঐ খনার অনেক বচন অবগত আছেন এবং তদনুসারে বিবাহাদি শুভকর্ম্মের দিন ও লগ্ন নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। অনেকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, কিছু কাল হইল হঠীবিদ্যালঙ্কার নামে প্রসিদ্ধ এক রমণী বারাণসীক্ষেত্রে মঠ নির্ম্মাণ করিয়া ভূরি ভূরি ছাত্রদিগকে বিদ্যাদান করিয়াছেন। আমরা অনুসন্ধান করিয়ে আরো কতকগুলি পণ্ডিতা বনিতার নাম উল্লেখ করিতে পারি কেবল পাঠকবর্গেরা বিরক্ত হইবেন ভাবিয়া বিরত হইলাম।..

স্ত্রীলোকের বিদ্যাভাস শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়। আমরা পুরাণ ইতিহাস ধর্ম্মশাস্ত্র সমুদায় শাস্ত্র উদ্ঘাটন করিয়া সকলের সমক্ষে দেখাইতে পারি ''স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা করিতে নাই'' এমত প্রমাণ কেহ একটীও দেখাইতে পারিবেন না, বরং পুত্রের মত কন্যাদিগের বিদ্যাশিক্ষার বিধানই সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবেন। যদি এই কর্ম্ম শাস্ত্রনিষিদ্ধ হইত তবে প্রাচীন মহাজনেরা কদাপি স্বয়ং অনুষ্ঠান করিতেন না।...

বিদ্যাভ্যাস করিলে নারীগণ বিধবা হয়, এই আপত্তি শুনিয়ে

হাস্য করাই বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সমুচিত উত্তর প্রদান। কারণ বিদ্যাভ্যাসের সহিত বৈধব্য ঘটনার কিরূপ কার্য্যকারণভাব ঘটিতে পারে। পতির মৃত্যু হইলে নারী বিধবা হয়, এই পতিমরণরূপ দুর্ঘটনা যদি স্ত্রীর বিদ্যাভ্যাসরূপ কারণবশতঃ উৎপন্ন হইতে পারে, তবে এক জনের মাদকদ্রব্য সেবনে অন্য জনের মত্ততা অন্য জনের চক্ষুর্লৌহিত্য অপর ব্যক্তির বুদ্ধিভ্রম ও তদিতবের বাক্যস্খলন সর্ব্বদাই সম্ভবিতে পারে। ফলতঃ বিদ্যার এমত মারাত্মক শক্তিও এপর্য্যন্ত কেহই অনুভব করেন নাই।... বিদ্যাভ্যাস করিলে নারী দৌর্ভাগ্য দুঃখভাগিনী হয়, ইহা আরও হাসিবার কথা। যাহারা কহেন বিদ্যাভ্যাস করিলে নারীগণ মুখরা দুশ্চরিত্র ও অহঙ্কারী হইবে তাহাদিগকে উত্তর প্রদান সময়ে কিছু হিত উপদেশ দান করা বিহিত বোধ হইতেছে। বিদ্যাভ্যাসের ফলে মনুষ্যজাতি বিনয়ী সচ্চরিত্র ও শান্তস্বভাব না হইয়া তদ্বিপরীত হইয়াছে ইহা যদি কেহ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তবে তিনি আকাশপথে মনোহর উদ্যান মধ্যে সুরম্য হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে উত্তানপাদ হইয়া গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধরগণ গীতবাদ্য নাট্যক্রিয়াদি করিতেছে, ইহাও অহরহ দর্শন করিয়া থাকেন।

প্রায় অভিমন্যুর মতো মহনমোহন সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছেন। মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপনে সহায়তা করেছেন, নিজের মেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, শিশুপাঠ্য বই লিখেছেন, সেই সঙ্গে অক্লান্ত লড়াই চালিয়েছেন বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে। সভাসমিতিতে ভাষণ বা পত্রপত্রিকায় লেখালিখির মাধ্যমে সচেতন করতে চেয়েছেন সাধারণ মানুষকে। হয়ত লড়াই করতে করতে কখনও ক্লান্ত বা হতাশ হয়ে পড়তেন। তাতেই তাঁর মুখে শুনি—'হে করুণাময় জগদীশ্বর! আমাদিগের দেশীয় লোকের অন্তঃকরণ হইতে কুসংস্কার ও কুমতি দূর করিয়া সুমতি প্রদান করুন যাহাতে সকলেই একমনা, এককর্ম্মা ও এক উদযোগ হইয়া দৃঢ়তর অধ্যবসায়ে আরোহণপূর্ব্বক আপন আপন নন্দিনী ও গৃহিণী প্রভৃতি স্ত্রীপরিবারকে বিদ্যাভ্যাস কার্য্যে নিয়োজিত করেন।'

শুধু মেয়েদের লেখাপড়া নয়, তাদের স্বাবলম্বী করে তোলার কাজ আমৃত্যু করে গিয়েছেন। উদরাময়-রোগপ্রবণ ছিলেন। আর কলকাতা ছিল তখন রোগের ডিপো। তাই তিনি মুর্শিদাবাদের জজ পণ্ডিতের পদে যোগ দেওয়ার জন্য বেথুনকে বলেন। বেথুন লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে বলে ব্যবস্থা করে দেন। ১২৫৭ সালে তিনি মুর্শিদাবাদে যান। সেখানে গিয়েই শিক্ষাবিস্তারের পাশাপাশি সামাজিক কাজও শুরু করেন। বিধবা ও অনাথ বালক-বালিকাদের জন্য একটি দাতব্যসভা স্থাপন করেন। সেখানে তারা জীবিকা অর্জনের উপায় পেত। একটি অতিথিশালাও করেছিলেন। যেখানে দৃষ্টিহীন, বিকলাঙ্গদের অন্ন ও আশ্রয় দেওয়া হত। এরকম উদ্যোগ তৎকালে অভিনব বলা চলে।

তিনি ছ বছর জজ পণ্ডিতের কাজ করার পর মুর্শিদাবাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। ওই সময়ে বিধবা বিবাহ আন্দোলন শুরু হয়েছে। শ্রীশবাবু প্রথম বিধবাবিবাহ প্রণেতা। মদনমোহন তাঁর বিয়ের যোগাযোগ করেছিলেন এবং তিনিই প্রথম এক বিধবা বালিকাকে বিয়ে দেন। এই মেয়েটি তার মায়ের সঙ্গে মদনমোহনের শ্বশুরবাড়ি আসা-যাওয়া করত। মদনমোহনই উদ্‌যোগ নিয়ে মা ও কন্যাকে কলকাতায় পাঠান। কন্যাসম্প্রদানও করেন। একে নিজের দুই মেয়েকে স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারটা তৎকালীন সমাজ ভালো চোখে দেখে নি। তার ওপর বিধবা বিবাহ দেওয়ায় তিনি দেশের লোকের বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। এই দুই অপরাধের জন্য তাঁকে আট-ন বছর সমাজচ্যুত করা হয়েছিল। তবে তাতে মদনমোহনের উদ্যমে ভাটা পড়ে নি। মুর্শিদাবাদে এক বছর ডেপুটি পদে থাকার পর তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। ময়ূরাক্ষী নদীর তীরবর্তী কান্দিনগরে বদলি হতে চান। তাঁর জন্যই কান্দিতে নতুন মহকুমা গঠিত হয়। সেখানে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। সেখানে তখন রাস্তাঘাট, স্কুল কিছুই ছিল না। মুর্শিদাবাদের মতো কান্দিতেও তিনি একটি অনাথমন্দির স্থাপন করেন। বহু পরিত্যক্ত বালক-বালিকাকে তিনি পথ থেকে কুড়িয়ে এনে এখানে যত্নে পালন করতেন। তর্কালঙ্কার তাঁর কন্যাদের পুত্রদের মতো করেই বড় করেছিলেন। সেই সময় ভয়ঙ্কর ওলাউঠা রোগ ছড়িয়ে পড়লে তর্কালঙ্কার আক্রান্ত হন। কান্দিতে তাঁর সুচিকিৎসা করা যায় নি। তিনি প্রয়াত হন। তাঁর বড় মেয়ে ভুবনমালাও ওই রোগে আক্রান্ত হন। প্রাণপ্রিয় পিতার মৃত্যুর পর তাঁর বেঁচে থাকার আগ্রহ চলে যায়। তাঁকে বহরমপুরে সুচিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায় নি। তিনি পিতার প্রয়াণের এক-দুদিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন।

তর্কালঙ্কারের এক জীবনীকার জানিয়েছেন, 'তর্কস্থলে তিনি বর্ত্তমান অনিশ্চিত-বাদীদিগের (Sceptics) ন্যায় মত প্রকাশ করিতেন। ঈশ্বর তত্ত্ববিষয়ে তাঁহার প্রকৃত বিশ্বাস অনির্ণীত থাকিলেও মনুষ্যজাতির হিতসাধন যে তাঁহার জীবনের এক মাত্র ব্রত ছিল ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে।' এই ধর্ম ও ঈশ্বর নিয়ে মাতামাতি না করাটা ধর্মপ্রাণ বাঙালির প্রাণে সয় না, তারা এটাকে ভলো চোখে দেখে না। তাই ধর্মীয় ব্যক্তিদের যত মাথায় তুলে নাচানাচি করি, পক্ষান্তরে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্রফুল্লচন্দ্র, সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহাদের মতো মদনমোহনকেও আমরা ভুলে থাকতে চাই। আমরা ভুলে থাকলে ওঁদের অবশ্য কোনো ক্ষতি নেই। আমাদের ক্ষতি, আমাদের জাতিগত লজ্জা, এই আর কি! উমা

ফাঁসির সাজা

বোলান গঙ্গোপাধ্যায়

১৯৯০ সালে ৫ মার্চ অষ্টাদশী হেতাল পারেখ ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় ১৪ বছর কারাদণ্ড ভোগ করার পর, ২০০৪-এর ১৪ আগস্ট ফাঁসি হয়েছিল হেতালের আবাসনের কেয়ার টেকার ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের। তখনও মামলা চলাকালীন, বিচার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগেই, তদানীন্তন সরকার ফাঁসির দাবিতে মারমুখী হয়ে উঠেছিল। এখনকার মতো তখন কোর্ট অর্ডার 'করিয়ে' আনার বে-আইনি হুমকির অতি সক্রিয়তা দেখা যায় নি কিন্তু আইনি ব্যবস্থার ওপর পরোক্ষ চাপ সৃষ্টির চেষ্টার খামতি ছিল না।

জনমত সৃষ্টিতে যতখানি যুক্তি ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল আবেগে আঘাত করার চেষ্টা। কিশোরী হেতালের জন্য সুবিচার চাওয়ার জোর যতখানি ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল ধনঞ্জয়কে শাস্তি দিয়ে ক্ষমতা দেখানোর চাপ। এবং সেই ক্ষমতা আসলে জনগণের হাতেই আছে, এই ভাবনাকে চালিত করার চেষ্টা। সাদা বাংলায় আমরা যাকে বলি, লোক খেপানো। যা কিনা তলিয়ে যুক্তিসিদ্ধ ভাবনার পরিপন্থী। কেন চাইছি? কী পরিণাম এই চাওয়ার? সে প্রশ্ন করার অবকাশই নেই। এখনকার মতোই, তখন এমন একটা জিগির উঠল যে ধনঞ্জয়কে ফাঁসি দিতে পারলেই, ধর্ষণের দিন শেষ। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি মানেই ফাঁসি। ধনঞ্জয়কে সমান সুযোগ দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে দেওয়া মানে ধর্ষণকে সমর্থন করে মেয়েদের তথা সমাজের সর্বনাশ ডেকে আনা। অবিশ্বাস্য মনে হলেও, সমাজের গণ্যমান্য মানুষের গলায় প্রকাশ্য জনসভায় এইরকম মন্তব্যও শুনেছি। অর্থাৎ আইন, প্রমাণ, যুক্তি-প্রতিযুক্তি সব কিছুর ওপরে গণ হিস্টিরিয়ার দাবিতে শিলমোহর লাগানোই আইনি ব্যবস্থার কাজ। এবং গণ হিস্টিরিয়াকে সুচতুর উপায়ে ব্যবহার করে রাষ্ট্র যাতে তার যাবতীয় সদর্থক ভূমিকার দায় ঝেড়ে ফেলে, সমস্ত রকম জবাবদিহির বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে, রাষ্ট্রবাদী ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলিরও সেটাই আশু কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সার্বিক এই ঢক্কানিনাদে চাপা পড়ে যায় যুক্তিবাদীদের কণ্ঠ। মানবাধিকার রক্ষা বা জেলখানাকে সংশোধনাগার করে তোলার সঙ্গত যুক্তিসিদ্ধ অধিকারের দাবি। কথা বলার তেমন পরিসরই তৈরি করতে পারেন নি। ফলে, ধনঞ্জয়ের বিচার প্রহসনের নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আমাদের অনেকের মনেই একটা ধারণা কাজ করে যে, একজন বা এক ডজন ধর্ষকের যদি ফাঁসি দেওয়া যায়, তাহলে অন্যান্য ভবিষ্যৎ ধর্ষকরা ভয় পেয়ে এই কাজ থেকে বিরত থাকবে। কার্যত ফাঁসির ভয়ে ধর্ষণ কম হয়েছে, এইরকম কোনও সত্য, পরিসংখ্যান বা গবেষণায় উঠে আসে নি।

পৃথিবীতে ফাঁসির সাজা যে সর্বত্র প্রচলিত আছে, এমনও নয়। ১৯৪৮ সালে 'ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস'-এর ঘোষণা অনুযায়ী মানুষের বাঁচার অধিকার, এবং মুক্তভাবে বাঁচার অধিকার দুটি মূল অধিকারই এই সাজা কার্যকর করার দ্বারা লঙ্ঘন করা হচ্ছে। ইউরোপের সুইডেন, অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, পোল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, লাটভিয়ার মতো দেশগুলিতে ফাঁসির সাজা নেই। লাতিন আমেরিকার চিলি, আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, ব্রাজিলে বা আফ্রিকার কেনিয়া, সুদান, জাম্বিয়া এমনকি, প্রতিবেশী নেপাল, পাকিস্তান, মঙ্গোলিয়াতেও ফাঁসির সাজা রদ হয়েছে।

কোনও বিচারই শেষ বিচার হতে পারে কি? এই প্রশ্ন থেকেই যায়। কিন্তু মানুষের প্রাণ কেড়ে নিলে, তারপর বিচারের বাণী আর ফিরিয়ে নেওয়ার পথ থাকে না। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড আর ফাঁসির মধ্যে এতটাই তফাৎ। হেতালের ধর্ষণ এবং হত্যা মামলায় অনেক ফাঁক-ফোঁকড় ছিল। এমনকি সরকারি রিপোর্টেই ধর্ষণের উল্লেখ ছিল না। সঙ্গম বলা হয়েছিল। সরকার পক্ষের সব যুক্তিই ছিল পারিপার্শ্বিক তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে। বস্তুত ধর্ষণ বলে দেগে দেওয়া হলেও, বল প্রয়োগের প্রমাণ পাওয়া যায় নি। গোটা বয়ানটি তৈরি হয়েছিল হেতালের দাদা ও বাবার কথার ভিত্তিতে। তার চেয়েও সন্দেহজনক লাগে, মৃতদেহ দেখার ৩ ঘণ্টা পর পুলিশকে খবর দেওয়া এবং সেই রাতেই পুলিশ অফিসার প্রসুন মুখার্জীর সাংবাদিক বৈঠক করে ধনঞ্জয়কে চিহ্নিত করার তৎপরতা। সেখানেও আর জি করের ঘটনার মতো ঘটনাস্থলে নমুনা সংগ্রহের আগে অনেক মানুষ ঢুকেছিল।

উল্টোদিকের নানা পারিপার্শ্বিক ঘটনা বিশ্লেষণ করে অনার কিলিং-এর তত্ত্ব উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যা কিনা ঠিকভাবে

বিচারকের সামনে তুলেই ধরা হয় নি। এবং আমরা জানি যে বিচারককে অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সরকারি রিপোর্ট এবং পুলিশের দায়ের করা তথ্যের ওপর নির্ভর করেই বিচার করতে হয়। উল্টোদিকের আইনজীবী যদি চৌখশ না হন, বা অমনোযোগী হন, তাহলে প্রতিপক্ষের সঙ্গে এঁটে ওঠা যায় না। ধনঞ্জয়ের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে। ফাঁসির পর জানা গেছে তার আইনজীবী ঠিকমতো টাকা না পেয়ে, তার বাবার কাছে অভিযোগ জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। এবং গোটা কেসের শুনানি ও সাক্ষ্য যদি অনুসরণ করা যায় তাহলে এই আইনজীবীর অমনোযোগের স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়।

আজ ২০ বছর পর সরকারি তরফে ঠিক একই তৎপরতা ঘটতে দেখছি, আর জি কর হাসপাতালের ৯ আগস্টের ঘটনায়। এখানেও বিচার হওয়ার আগেই সরকার পক্ষ ফাঁসির আইন তৈরি করতে কোমর বেঁধে লেগেছে। সেদিন অর্থ ও প্রতিপত্তিবান হেতালের পরিবারের কাউকে বা পরিবারের পরিচিত কাউকে আড়াল করার জন্য তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল প্রশাসনিক ব্যবস্থা। আজ সেই একইভাবে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবশালীদের রক্ষা করতে উঠে পড়ে লেগেছে প্রশাসন। এই ঘটনার সঙ্গে হেতালের ঘটনার বেশ কিছু মিল থাকলেও, অনেক পার্থক্যও আছে। প্রধান পার্থক্য এই যে, এটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ষণ ও হত্যা। সরকারি হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় এই ঘটনা ঘটেছে। তাই নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সরকারের দায়ও অনেক বেশি। এই কাজ যে একা একজন আসুরিক শক্তির মানুষের দ্বারাও সম্ভব নয়, একথা বোঝার জন্য নিরপেক্ষ স্বাভাবিক বুদ্ধিই যথেষ্ট। তাছাড়াও এতদিনে সংবাদমাধ্যমে বহু মানুষের কথা শুনে ও বিচার সভার প্রক্রিয়া দেখে, সাধারণ মানুষ নিশ্চিত হয়েছেন যে, এই ঘটনা অনেকে মিলে ঘটিয়েছে। এতবড় অন্যায় ঘটাতে পরিকল্পনা দরকার হয়, সেখানে অনেকেরই পরামর্শ ও সক্রিয় সহায়তা লাগে। এবং যারা সন্দেহের তালিকায়, তারা সকলেই সরকারি কর্মচারী, তাই তাদের কৃতকর্মের দায় সরকারের থেকেই যায়। তারপর আসে তথ্য প্রমাণ লোপের দুরভিসন্ধির কথা। যারা এই অপরাধ ঘটায়, তারা আইন জেনে, আঁটঘাঁট বেঁধেই ঘটায়। বিশেষত সেই আঁটঘাঁট যদি রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায় হয়, তাহলে কাজটা আরও নিখুঁত ও সহজ হয়।

ভুলে গেলে চলবে না, বিভিন্ন স্বাধীন এজেন্সি বলে আমরা যাদের জানি, তারা কতখানি স্বাধীন, সেটাও প্রশ্নাতীত নয়। বস্তুত এই কাঠামোর বাইরে আমাদের, প্রজা সাধারণের যাওয়ার কোনও পথ নেই। আর জি করের ঘটনা প্রমাণ করে চলেছে যে, কাঠামোর যাথার্থ্য নিয়ে ভাবার সময় সমাগত। প্রমাণ লোপাট প্রমাণ করার রাস্তা চাই। এই প্রমাণ লোপাটের অন্যতম অংশ সঞ্জয়কে কথা বলতে না দিয়ে ফাঁসি দিয়ে কেস ক্লোজ করে দেওয়া। যাতে সাপও মরবে আর লাঠিও ভাঙবে না।

কিন্তু একটা বিষয় আমরা সকলেই জানি যে, এই ঘটনা গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত প্রাতিষ্ঠানিক অপরাধের মূল ধরে নাড়া দিয়েছে। সামাজিক ও কর্মক্ষেত্রের পরিবেশে নারী সুরক্ষার প্রশ্ন তুলেছে। সঞ্জয়ের ফাঁসির সঙ্গে তার উত্তর পাওয়া না পাওয়া নির্ভর করে না। ধর্ষণ কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটি সমাজ মানসিকতা আর পুরুষ শাসিত ব্যবস্থার আধিপত্যের প্রকাশ। সেই প্রশ্ন এড়িয়ে কোনও চটজলদি সমাধানের রাস্তা নেই।

সঞ্জয় সম্পর্কে যতটুকু জানতে পেরেছি, এবং দেখতে পেয়েছি, তাতে তার দেহের ভাষায় ও চোখের চাউনিতে মনে হয়েছে, হয়ত সঞ্জয়ের কোনও জটিল মানসিক অসুস্থতা আছে। তার চিকিৎসা প্রয়োজন। সঞ্জয়ের চিকিৎসা করানো হলে, তার হত্যা ও ধর্ষণের অপরাধ কমে যায় না। নির্যাতিতার অসম্মানও হয় না। সুস্থ মানসিকতা নিয়ে একজন নাগরিক তার বাঁচার পথ খুঁজে পেতে পারেন। সেটা কি আমরা চাই? না চাই না? এ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে।

ফাঁসির শাস্তি আদতে সরকারের এসকেপ রুট। দায় ঝেড়ে ফেলার একটা রাস্তা। তার বেশি কিছু না। আর সঞ্জয়ের তো আমৃত্যু ফাঁসির সাজা হয়েছে, বেরিয়ে আসার কথা না। প্রশাসনিক অপদার্থতা আর সামাজিক পরিবেশের কদর্য চেহারা ঢাকার জন্য আইনি ব্যবস্থার ব্যবহার বন্ধ হোক।

উমা

শিক্ষানুরাগী ডেভিড হেয়ার ১৮১৮ সালে 'আরপুলি পাঠশালা' প্রতিষ্ঠা করেন।যেটি পরে হয় 'কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল'। ১৮৬৭-তে প্রতিষ্ঠাতার নামে হেয়ার স্কুল। হেয়ার স্কুলের আদর্শবাণী (motto) 'তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ'। সম্প্রতি হেয়ার স্কুল প্রাঙ্গণে মানসিক চাপ দূর করা নিয়ে জনৈক মাতা-জির ভক্তদের তত্ত্বাবধানে ক'দিন ধরে কর্মশালা আয়োজন করা হয়। তাতে যোগ দিয়েছিলেন পড়ুয়া ও তাদের অভিভাবকরা। ভক্তরা মানসিক চাপ কাটাতে নানান পরামর্শ দেন যেগুলি চিকিৎসক ও মনোবিজ্ঞানীরা একেবারেই নাকচ করে দিয়েছেন। ঐতিহ্যবাহী হেয়ার স্কুল ভুয়োবিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হল।

ঘুমের ইতিবৃত্ত

নতুন উপদ্রব — নিশাচর মানুষদের অসুস্থতা

গৌতম মিস্ত্রী

নিশির ডাক বা রাতের ডাকাতির কথা বলছি না। অভিজাত তরুণ-তরুণী বাঙালি তথা ভারতীয় কিশোর কিশোরী উচ্চশিক্ষার শেষে আইটি কোম্পানির একটা চাকরি পেলে গোটা পরিবার একাধিক পার্টি থ্রো করে। সবাইকে কী একটা পার্টিতে ডাকা যায়! আমেরিকায় যাওয়া না গেলেও ক্ষতি কী? দেশে থেকে বাড়িতে আলু সেদ্ধ ভাত খেয়ে আর সেক্টর ফাইভের অফিসে স্যান্ডউইচ, বার্গার, পিৎজা আর কোক খেয়ে আমেরিকার কোম্পানিতে অনলাইন কাজ করে দেশে বসেই আমেরিকার উত্তাপ আর লোভনীয় মাইনে পাওয়া যায়।

এই সম্ভ্রান্ত কাজের ছলে এঁদের সিংহভাগ আমেরিকার বিক্রি হয় এমন পণ্যের, সেটা আলপিন বা অ্যাপেল ফোন হতে পারে, আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের অভিযোগ শোনেন ও ফ্লো-চার্ট মেনে ক্রেতার ক্ষোভকে কিছুটা প্রশমিত করেন। এটা কল সেন্টারের চাকরি বটে। অবশ্য অন্য রকমেরও কাজ করতে হয়। তবে এইসব কাজ করতে হয় মাঝরাতে। ভারতের মাঝরাতেই আমেরিকার প্রভুদের সকাল হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের আইটি ভাই-বোনেদের এই সম্ভ্রান্ত কাজের জন্য ঘুমের সময়টা রি-সিডিউল্ড করতেই হয়। তাঁদের ঘুমের জন্য দিনের বেলা বরাদ্দ থাকে। দিনের অবেলায় ঘুমের জন্য অনেকেরই ঘুমের ওষুধের প্রয়োজন হয়।

শ্বাস নেওয়া, খিদে পেলে খাওয়া, সন্তানের জন্ম দেওয়া ও তাদের প্রতিপালন করা ইত্যাদি কাজের মতো ঘুম মানুষের একটি মৌলিক চাহিদা। ঘুম একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া। ঘুমের জন্য সুস্থ মানুষকে আলাদা করে চেষ্টা করতে হয় না। ঘুমের সময়ে মানুষ চারপাশের ঘটনাবহুল পরিমণ্ডল থেকে সাময়িক কালের জন্য বিরতি নেয়। ঘুমের বিরতিতে পেশি শিথিল হয়ে যায়, শরীরের শক্তি উৎপাদন ও তাঁর ব্যবহার সবচেয়ে কমে যায়। ঘুমের সময়ে মানুষের শরীর সমস্ত অঙ্গকে সর্বোচ্চ মানের বিশ্রাম দিয়ে পরের দিনের জন্য সতেজ করে যায়। এর ফলে আমরা কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারি। বিরূপ পরিবেশে টিকে থাকতে পারি। কাজের শেষে বিনোদন আনন্দে উপভোগ করতে পারি। মানুষকে তার জীবনের এক তৃতীয়াংশ সময় ঘুমাতে হয়, বাকি দুই তৃতীয়াংশ সময়ে সানন্দে কাজকর্ম করার জন্য আর অবসর সময়ে তৃপ্তির বিনোদনের জন্য। সুস্থ মানের, উপযুক্ত পরিমাণের ঘুম আমাদের স্মৃতিবৃদ্ধি করে ও মনের প্রতিবর্ত ক্রিয়া (reflex) উন্নত করে।

রাতের অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা মস্তিষ্ক থেকে যে মেলাটোনিন উৎসেচক তৃপ্তির ঘুমে সঙ্গত দেয়, ঘুমের ওষুধের প্রভাবে দিনের ঘুমে সেই তৃপ্তি নেই। দুধ আর পিটুলি গোলা (চালের গুঁড়ো) জলে যে ফারাক, রাতের প্রাকৃতিক ঘুম আর আপসের, অসময়ের ও ওষুধের প্রভাবের ঘুমে সেই ফারাক। আমার অনেক নিবন্ধের পিছনে এক বা একাধিক সত্যি গল্প থাকে। এই নিবন্ধের জন্য ২৪ বছরের এক অভাগা তরুণীর অকাল হৃদরোগের সত্যি গল্প সেটাই। ইনি বিগত তিন বছর রাতে আইটি সেক্টরে কাজ করেন, দিনে ঘুমান। এখন তিনি তারুণ্যে বার্ধক্যের হৃদরোগে আক্রান্ত। তাঁর সুগার বা প্রেশারের রোগ নেই। তিনি মোটাও নন। তাঁর রক্তের কোলেস্টেরলও একদম স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় তাঁর ঘুমের অভাবই পড়ে থাকে ভিলেন হিসাবে।

স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনের (Life style) শর্তগুলো সব এখনও জানা যায় নি। কিন্তু সেই শর্তের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। অথবা বলা যায়, জটিল জীববিজ্ঞানের অজানা বিষয়গুলো ক্রমেই উন্মোচিত হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান হৃদরোগের নিবারণে পশ্চিমী দুনিয়ার চিকিৎসা বিজ্ঞান একের পর এক ভিলেনকে নিশানায় আনছে। পুরনো সাতটি ভিলেনের (১.উচ্চ রক্তচাপ, ২. ডায়াবেটিস, ৩. রক্তে উচ্চ মাত্রার কোলেস্টেরল, ৪. তামাকে আসক্তি, ৫. স্থূলতা, ৬. শরীরচর্চা না করা, ও ৭. অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস) পরে এবার অষ্টম ভিলেন হল অনিদ্রা। মোট আটটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে সুস্থ থাকার নবতম অভিজ্ঞান হল 'এল ই ৮' বা লাইফ'স এসেন্সিয়াল ৮। খাদ্যাভ্যাস, শরীরচর্চা, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, স্থূলতা নিরাময়, রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণ, রক্তের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ, তামাকের কু-অভ্যাস বর্জন—এই সাতটি ঝুঁকি জানা ছিল। এই সাতের সঙ্গে নবতম সংযোজন ঘুম। এটা সংশয়াতীতভাবে জানা গেছে, দিনের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নিদেন পক্ষে সাত থেকে আট ঘণ্টার প্রাকৃতিক ঘুম দরকার রাতের বেলায়। পূর্বতন

সাতটি অস্বাস্থ্যকর অবস্থা নিয়ে আমরা অনেক কথা শুনেছি, আগে কিছুটা আমিও ক্ষীণ স্বরে বলেছি। ঘুমের পরিমাণ ও মানের কথা আমরা হয় জানি না বা অল্প জানি। এবারের আলোচনা স্বাস্থ্যকর ঘুমের প্রয়োজনীয়তা ও তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে। এটা সংশয়াতীতভাবে জানা গেছে, দিনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিদেন পক্ষে ৭-৮ ঘণ্টার ঘুম দরকার রাতের বেলায়। রাতের বদলে দিনের ঘুম আর প্রাকৃতিক ঘুমের বদলে ঘুমের ওষুধের ঘুমে স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনের শর্ত মানা হয় না। কতটা অমান্য করা হয়, বা তার মূল্য কতটা সেটা এখনও নির্ধারণ করা যায় নি।

অজৈব পদার্থ হিসাবে মোটর গাড়ি থেকে মোবাইল ফোনকে কাজে ছুটি দিতে হয়, বিশ্রাম দিতে হয় তার কর্মক্ষমতা বজায় রাখার জন্য। আদিকাল থেকে উদ্ভিদ থেকে চলমান সব জৈব পদার্থের ঘুমের দরকার হয় প্রাকৃতিক নিয়মে। ঘুমে ঘাটতি পড়লে আমাদের কর্মকুশলতা ব্যাহত হয়। তার চেয়েও বড় ক্ষতি—আমাদের স্বাস্থ্য বিপন্ন হয়ে পড়ে। অনিরাময়যোগ্য, অসংক্রামক রোগভোগের নিয়ন্ত্রণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০২৫ সালে ১১ ফেব্রুয়ারি নুন খেতে রাশ টানতে বলেন, খবরের কাগজের খবরে।[1] এই কথা উৎস মানুষ পত্রিকায় বলেছিলাম এক দশক আগে।[2] সেই ধারা মেনে, খবরের কাগজে স্থান পাওয়ার আগে আমরা প্রয়োজনীয় ঘুমের পরিমাণ ও গুণগত মান নিয়ে আলোচনা করার দায় মেনে নিচ্ছি। স্বাস্থ্যকর, অবহেলিত, অথচ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ঘুমের পরিমাণ ও মানের প্রশ্নেরও উত্তর পাওয়া যাবে এই রচনায়।

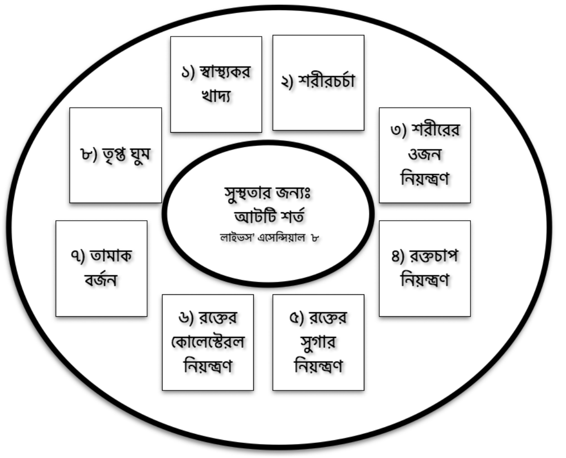

রঙ্গিলা বাঁশিতে কে ডাকে? ঘুম ঘুম নিঝুম রাতের মায়াঃ

স্বাস্থ্যকর ঘুম — নবজাতক ঘুমায় দিনে ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা। প্রাপ্তবয়স্কদের প্রয়োজন দিনপ্রতি ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা এবং জৈবিক নিয়ম মতে সেটা দিনে নয়, রাতে। আলো নিভিয়ে চোখ বুজলে আমাদের ঘুমের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ঘুমের স্তর হরেক রকমের। হাল্কা ঘুম পলকা। একটু আওয়াজ হলেই ঘুম ভেঙে যায়। আবার গভীর ঘুমে বাড়িতে চোর ঢুকলেও ঘুম ভাঙে না। সময়ের মাগ্গিগণ্ডার বাজারে অপ্রতুল মহার্ঘ ঘুমের মান প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। যত গভীর ঘুম, ঘুমের বাজারে সেই ঘুম ততই দামী। ততই ক্লান্তিহরা। ঘুমের সময় মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ (ই ই জি), চোখের মণির চাঞ্চল্য আর পেশির শিথিলতা লিপিবদ্ধ করলে ঘুমের মূল দু'টি অংশ চিনে নেওয়া যায়। ঘুমের শুরুতে আসে 'নন আর ই এম' ঘুম (Non rapid eye movement sleep, Non Rem sleep, NREM), আমরা একে 'এনারেম' ঘুম বলব। এর পরে আসে 'আর ই এম' ঘুম (Rem sleep), আমরা একে 'রেম' ঘুমের স্তর বলব। সারা রাতে পর্যায়ক্রমে চার থেকে পাঁচটি 'এনারেম' - 'রেম' - 'এনারেম' ঘুমের চক্র চলতে থাকে আর সকালে নিদ্রাদেবী 'এনারেম' ঘুম থেকে 'রেম' ঘুমে না গিয়ে আমাদের জাগিয়ে দেয়। 'এনারেম' -'রেম' -'এনারেম' এই এক একটি পর্যায়ের চক্রের স্থায়িত্বকাল ৯০-১২০ মিনিটের। ঘুমের শুরু থেকে শেষের দিকে এই চক্রের স্থায়িত্বকাল ক্রমশ কমতে থাকে ও ৭ থেকে ৮ ঘণ্টায় ঘুমে মোট চার থেকে পাঁচটি 'এনারেম'- 'রেম' - 'এনারেম' ঘুমের চক্র চলতে থাকে।

আলো নিভিয়ে চোখ বুজলে 'এনারেম' ঘুম দিয়ে ঘুম শুরু। 'এনারেম' ঘুমে চোখ নাচে না, স্বপ্ন দেখলে মনে থাকে না। 'এনারেম' ঘুমের প্রথম অংশ তন্দ্রা। তন্দ্রা দিয়ে ঘুম শুরু। এই অংশ মোট ঘুমের ১০ শতাংশ, যেটার পোশাকি নাম 'এনারেম-১'। ঘুমের এর পরের স্তর 'এনারেম-২', যেটা মোট ঘুমের ৫০ শতাংশ। ঘুমের ওষুধে এই স্তরের ঘুম বেড়ে যায়। 'এনারেম' ঘুমের পরের ও শেষ স্তর 'এনারেম-৩', যেটা মোট ঘুমের ২০ শতাংশ। ঘুমের এই পর্যায় বেশ গভীর—ঘুম থেকে আমাদের জাগানো মুস্কিল হয় এই স্তরে। 'এনারেম' ঘুমের তিনটি স্তর পেরিয়ে শেষে আসে তূরীয় 'রেম' ঘুম, যেটা কিনা মোট ঘুমের ২০ শতাংশ। 'রেম' ঘুমে আমরা সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রাণবন্ত (vivid) স্বপ্ন দেখি ও জাগার পরে স্বপ্ন মনে করতে পারি। 'রেম' ঘুমকে তাই আমরা 'স্বপ্নের ঘুম' বলতে পারি। স্বপ্নের ঘুম আক্ষরিক অর্থেও, কারণ এই ঘুমে আমাদের ক্লান্তিহরণ হয় বেশি

(পরের অংশ ২২ পাতায়)

মহাকুম্ভের অমৃত-পুণ্য

অনার্য মিত্র

১.

দিনরাত তুমি করে যাও
শুধু মহাকুম্ভের স্তব,
বিশ্বের সেরা পুণ্যলাভের
অমৃত মহোৎসব।

ত্রিবেণী-তীর্থে যেতে হয়
তাই মহাপুণ্যের টানে,
কোটি কোটি জন ধন্য হলেন
মহাপুণ্যের স্নানে।

এ জলে দূষণ-বিষ মিশে থাকে থাক্
মেখে নাও সারা অঙ্গে,
ধ্বনি তোলো শুধু দুটি হাত তুলে
গঙ্গে নমামি গঙ্গে।

শত শত কোটি বাণিজ্য হলো
গাও তার জয়গীতি,
উন্নয়নের শিখরে ওঠার
এটাই নব্য রীতি।

ধর্মবিলাসী কর্মবিনাশী
এসে গেছে ধারাপাত,
এর তত্ত্বটি বোঝাবেন আজ
পরমাদিত্যনাথ।

২.

দেশভক্ত যে কতখানি তুমি
কতটা ধর্মনিষ্ঠ,
পুণ্যলাভের আশায় তুমি
হচ্ছ কি পদপিষ্ট?

ট্রেনে চড়ে যদি কুম্ভেও যাও
মুক্তিই যে অভীষ্ট
কী এমন ক্ষতি, ভক্তের ভিড়ে
হও যদি পদপিষ্ট?

কেউ তো তোমাকে হত্যা করেনি
কেউ তো কাড়ে নি প্রাণ,
ভক্তের চাপে তোমার মুক্তি
ভক্তেরই অবদান।

এ জন্যে তুমি দায়ী কোরো নাকো
কক্ষণো প্রশাসনকে,
প্রণতি জানাও দেশচালকের
শীর্ষ সিংহাসনকে।

দেশটা যখন বিকশিত হয়
ফোটে শত শত পদ্ম,
পদপিষ্টেরা মুক্তির গাথা
লিখে যায় অনবদ্য।

উ মা

পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্জ্য অপসারণ

ফুকুশিমা-ডাইচি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাফাই কাজ করতে গিয়ে অতিমাত্রায় তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ও মানসিক চাপ নিতে হচ্ছে সাফাই শ্রমিকদের। আজ থেকে চোদ্দ বছর আগে অর্থাৎ ২০১১-তে সুনামি ও প্রবল ভূমিকম্প জাপানে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী ফুকুশিমা-ডাইচির পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রকে তছনছ করে দেয়। কর্মরত শ্রমিকদের তাৎক্ষণিক প্রাণহানির খবরকে ছাপিয়ে যায় মহাসাগরের জলদূষণ আটকানোর জন্য জরুরি ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে কি না? দুর্ঘটনা পরবর্তী বিপুল পরমাণু বর্জ্য সাফ করা, তা নিরাপদ জায়গায় সুরক্ষিত রাখা খুব বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। এতদিন পরে সেখানে যন্ত্রমানব ও শ্রমিকরা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এই কাজ করতে গিয়ে অতিমাত্রায় তেজস্ক্রিয়তা গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছেন। তাদের সঙ্গে ঢাল বলতে রয়েছে সার্জিক্যাল গ্লাভস, সাধারণ পোশাক। পরমাণু চুল্লি থেকে তেজস্ক্রিয় পরমাণু বর্জ্য বের করে আনতে হয়ত একশো বছর লেগে যাবে। এমন ধারণা অমূলক নয়। (সংক্ষিপ্ত ভাষান্তর)

সূত্র ঃ দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ১২.০৩.২০২৫

ভাইরাস : এক হেঁয়ালি

অরুণালোক ভট্টাচার্য

আজকের কবি হয়ত বলতেন — 'শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি ভাইরাস ...অর্ধেক জীবাণু তুমি অর্ধেক কল্পনা।' না, আজকের আলোচনা তথাকথিত জীববিজ্ঞানের কেতাবি ঢঙের বাইরে গিয়ে ভাইরাস নিয়ে দু-চার কথা। ইংরেজ 'virus' এসেছে লাতিন vîrus থেকে। যার অর্থ বিষ বা অন্যান্য ক্ষতিকারক তরল। অনুবাদক জন ট্রেভিসারের লেখায় ইংরেজিতে ভাইরাস শব্দের প্রথম প্রমাণিত ব্যবহার পাওয়া যায় ১৩৯৮ সালে। বার্থলোমিউস অ্যাংলিকাসের *De Proprietatibus Rerum* বোধহয় অধুনা এনসাইক্লোপিডিয়ার জনক। তার অনুবাদ করতে গিয়েই জন ট্রেভিসার ভাইরাস শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। রোগ সংক্রমণকারী জীবাণু হিসেবে অবশ্য এটিকে প্রথম আবিষ্কার করে রুশ বোটানিস্ট দিমিত্রি ইভানভস্কি। তামাক পাতার সংক্রমণ খুঁজতে গিয়ে তিনি দেখেন ব্যাক্টেরিয়ার চাইতে আকারে ছোট এক জীবাণু দিয়ে তামাক পাতা সংক্রমিত হচ্ছে। ব্যাকটেরিয়া ছাড়া এই জীবাণুর পৃথক অস্তিত্ব বোঝাতে ভাইরাস নামকরণটি কিন্তু করলেন সমসাময়িক ওলন্দাজ মাইক্রোবায়োলজিস্ট এবং বোটানিস্ট মার্টিনাস বেইজার্নিক। নাম-গোত্র সহ ভাইরাস নামক জীবাণুটি যেন ক্রমাগত এবং প্রতিনিয়ত মানবজাতিকে বাঁদর নাচ নাচিয়ে চলেছে। মানবজাতির আত্মশ্লাঘার স্ফীত বেলুনটিকে বারংবার ফাটিয়ে দিয়ে, ঐ একরত্তি জীবাণু-কণা যেন মানব বিবর্তনের ইতিহাসে এক অস্বস্তিকর যতি চিহ্নের মতো উদয় হয়। স্মরণাতীতকালে মানব সভ্যতার ইতিহাসে ভাইরাল সংক্রমণের কোনও প্রামাণ্য নথি না থাকলেও, স্মরণযোগ্যকালের উল্লেখ্য ভাইরাল সংক্রমণের একটা তালিকা তৈরি করার চেষ্টা করলাম।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে ভাইরাস সংক্রমণ — মানব সভ্যতার ইতিহাসে ভাইরাসজনিত মহামারী বা অতিমারি বারবার বিপর্যয় ডেকে এনেছে। অতীতের মহামারীগুলো শুধু জনসংখ্যার ওপর প্রভাব ফেলে নি, বরং অর্থনীতি, সমাজ এবং সংস্কৃতির গতিপথও বদলে দিয়েছে। নিচে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভাইরাস সংক্রমণ ও তাদের প্রভাব তুলে ধরা হল —

১. স্মলপক্স (গুটি বসন্ত) : স্মলপক্স বা গুটি বসন্ত একসময় বিশ্বের অন্যতম প্রাণঘাতী ভাইরাসজনিত রোগ ছিল। ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীরা যখন আমেরিকায় প্রবেশ করে, তখন তাদের নিয়ে আসা স্মলপক্স ভাইরাস আদিবাসীদের প্রায় ধ্বংস করে দেয়। ১৯৮০ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ঘোষণা করে যে পৃথিবী স্মলপক্স মুক্ত।

২. স্প্যানিশ ফ্লু (১৯১৮-১৯২০) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে এই ইনফ্লুয়েঞ্জা অতিমারি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রায় ৫০ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু ঘটায়। এটি ছিল ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ অতিমারি, যা আধুনিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেয়। দু'বছর ধরে চলা এই অতিমারিতে পৃথিবীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষই সংক্রমিত হন এবং ২ কোটি থেকে ৫ কোটি মানুষের মৃত্যু হয়।

৩. এইচআইভি/এইডস (১৯৮০র দশক-বর্তমান): এইচআইভি ভাইরাস মানবদেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস করে দেয়। ১৯৮০-র দশক থেকে এটি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং এখনও এটি একটি গুরুতর জনস্বাস্থ্য সমস্যা। অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপির উন্নতির ফলে সংক্রমণের হার কমানো সম্ভব হয়েছে।

৪. সার্স (২০০২-২০০৩) : সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম (SARS) করোনা ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত একটি ভাইরাসজনিত রোগ। এটি চীনের গুয়াংডং প্রদেশ থেকে শুরু হয়ে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। তবে দ্রুত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে এটি নিয়ন্ত্রণে আসে।

৫. সোয়াইন ফ্লু (২০০৯-২০১০) : এইচ১ এন১ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের একটি নতুন স্ট্রেইন থেকে উদ্ভূত সোয়াইন ফ্লু বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। যদিও এটি তুলনামূলকভাবে কম প্রাণহানির কারণ হয়েছিল, তবে এটি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করায়।

৬. ইবোলা (২০১৪-২০১৬, ২০১৮-২০২০): ইবোলা ভাইরাস সংক্রমণের ফলে পশ্চিম আফ্রিকায় ভয়াবহ মহামারী ছড়িয়ে পড়ে, যা প্রায় ১১,০০০ মানুষের মৃত্যু ঘটায়। উচ্চ সংক্রমণ হার ও উচ্চ মৃত্যুহার এটিকে অত্যন্ত বিপজ্জনক করে তোলে।

৭. কোভিড-১৯ (২০১৯-বর্তমান) : ২০১৯ সালের শেষ দিকে চীনের উহান শহর থেকে ছড়িয়ে পড়া সার্স-কোভ-২

ভাইরাস সারা বিশ্বে মহামারী সৃষ্টি করে। কয়েক মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু, দীর্ঘমেয়াদি লকডাউন, অর্থনৈতিক মন্দা—সব মিলিয়ে কোভিড-১৯ মানব ইতিহাসের অন্যতম স্মরণীয় মহামারী। টিকার উন্নয়ন ও ব্যাপক টিকাদানের ফলে সংক্রমণের হার কমানো সম্ভব হয়েছে।

উপসংহার : ভাইরাসজনিত মহামারীগুলো মানবজাতিকে প্রতিবার নতুন করে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নত করতে এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে অগ্রগতি আনতে বাধ্য করেছে। ভবিষ্যতে নতুন ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে গবেষণা, টিকা উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য ও জনসচেতনতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

জীবজগতের প্রায় সব ধরনের প্রজাতিকেই ভাইরাস সংক্রমিত করতে পারে। মানুষও তার ব্যতিক্রম নয়। এদের মধ্যে কিছু রোগ জীবন হানির কারণ হতে পারে, আবার কিছু রোগ তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিকর। নিচে বিভিন্ন ভাইরাসের নাম এবং তাদের দ্বারা সৃষ্টি কিছু সাধারণ মনুষ্য রোগ উল্লেখ করা হল—

১. করোনাভাইরাস পরিবার (Coronaviridae)

• SARS-COV—সার্স (SARS)

• MERS-COV—মার্স (MERS)

• SARS-COV-2—কোভিড-১৯ (COVID-19)

২. ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস (Orthomyxoviridae)

• H1N1, H3N2, H5N1 ইত্যাদি — ফ্লু (Flu)

• স্প্যানিশ ফ্লু (H1N1), সোয়াইন ফ্লু (H1N1), এভিয়ান ফ্লু (H5N1, H7N9)

৩. পক্সভাইরাস পরিবার (Poxviridae)

• Variola Virus —গুটি বসন্ত (Smallpox)

• Monkeypox virus — মাঙ্কিপক্স

৪. হের্পিসভাইরাস পরিবার (Herpesviridae)

• Herpes simplex virus-1 (HSV-1)—ঠোঁটের হার্পিস (Oral Herpes)

• Herpes simplex virus-2 (HSV-2)—যৌনাঙ্গের হার্পিস (Genital Herpes)

• Varicella-zoster virus (VZV)—জলবসন্ত (Chikenpox) এবং শিঙ্গলস (Shingles)

৫. প্যারামিক্সোভাইরাস পরিবার (Paramyxoviridae)

• Measles virus— হাম (Measles)

• Mumps virus— গলাফোলা বা মাম্পস (Mumps)

• Nipah virus—নিপাহ ভাইরাস সংক্রমণ

৬. ফিলোভাইরাস পরিবার (Filoviridae)

• Ebola virus —ইবোলা ভাইরাস সংক্রমণ

• Marburg virus — মারবার্গ ভাইরাস সংক্রমণ

৭. পিকোরনাভাইরাস পরিবার (Picornaviridae)

• Poliovirus —পোলিও

• Rhinovirus —সাধারণ ঠাণ্ডা (Common cold)

• Hepatitis A virus —হেপাটাইটিস এ

৮. ফ্ল্যাভিভাইরাস পরিবার (Flaviviridae)

• Dengue virus —ডেঙ্গু

• Zika virus —জিকা ভাইরাস সংক্রমণ

• Yellow fever virus —হলুদ জ্বর

• West Nile virus —ওয়েস্ট নাইল জ্বর

৯. রেট্রোভাইরাস পরিবার (Retroviridae)

• HIV (Human Immunodeficiency virus—এইডস (AIDS)

১০. অ্যারেনাভাইরাস পরিবার (Arenaviridae)

• Lassa virus —লাসা জ্বর

১১. রাবডোভাইরাস পরিবার (Rhabdoviridae)

• Rabies virus — জলাতঙ্ক (Rabies)

১২. রিওভাইরাস পরিবার (Reoviridae)

• Rotavirus — শিশুদের ডায়রিয়া

এই ভাইরাসগুলোর অনেকেরই প্রতিষেধক টিকা বা চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, তবে কিছু ভাইরাস এখনও মারাত্মক জীবাণু হিসাবে যাবতীয় মানব-চিকিৎসার বেড়াজালকে ফাঁকি দিয়ে, বহাল তবিয়তে বিরাজমান।

ভাইরাসজনিত সংক্রমণের ক্ষেত্রে চিকিৎসার জন্য প্রধানত দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়—**প্রতিরোধমূলক টিকা** এবং **অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ**। কিছু ভাইরাসজনিত সংক্রমণ সম্পূর্ণরূপে চিকিৎসাযোগ্য, আবার কিছু ক্ষেত্রে কেবল লক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। নিচে চিকিৎসাযোগ্য ভাইরাল সংক্রমণের তালিকা দিওয়া হল—

১. চিকিৎসাযোগ্য ভাইরাস সংক্রমণ (ওষুধ ও চিকিৎসা সহ)

(ক) সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য ভাইরাস সংক্রমণ—এ ধরনের সংক্রমণে কার্যকর চিকিৎসা ও ওষুধ রয়েছে, যা সংক্রমণ দূর করতে সাহায্য করে।

পোলিও (Polio) --- পোলিও টিকা; **গুটি বসন্ত (Smallpox)** — সম্পূর্ণ নির্মূল, টিকার মাধ্যমে প্রতিরোধ; **হেপাটাইটিস এ (Hepatitis A)** — নিজে থেকেই সেরে যায়, টিকা রয়েছে; **রেবিস (Rabies)** — রেবিস ভ্যাকসিন

এবং পোস্ট-এক্সপোজার প্রফিল্যাক্সিস (PEP); **রোটাভাইরাস (Rotavirus)** — টীকা দ্বারা প্রতিরোধ, সাপোর্টিভ কেয়ার; **হাম (Measles)** — এমএমআর (MMR) ভ্যাকসিন।

(খ) নিয়ন্ত্রণযোগ্য ও দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসাযোগ্য সংক্রমণ

এগুলো সম্পূর্ণ নিরাময় করা কঠিন, তবে দীর্ঘমেয়াদে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

এইচআইভি/এইডস (HIV/AIDS) — অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি (ART)

হার্পিস (Herpes - HSV-1, HSV-2) — অ্যাসাইক্লোভির (Acyclovir) ওযুধ।

হেপাটাইটিস বি (Hepatitis B) — অ্যান্টিভাইরাল ওযুধ, টিকা আছে।

হেপাটাইটিস সি (Hepatitis C) — সরাসরি কার্যকর অ্যান্টিভাইরাল (DAA) ওযুধ।

গ) লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসাযোগ্য ভাইরাস সংক্রমণ

এগুলোর নির্দিষ্ট কোনো প্রতিষেধক নেই, তবে লক্ষণ উপশমের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

ডেঙ্গু (Dengue) — সাপোর্টিভ কেয়ার, তরল গ্রহণ; **ইনফ্লুয়েঞ্জা (Flu - H1N1, H3N2)**—ওসেলটামিভির (Oseltamivir), টিকা; **জিকা ভাইরাস (Zika virus)** — লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা; **নিপাহ ভাইরাস (Nipah virus)** — সাপোর্টিভ কেয়ার; **ইবোলা (Ebola)** — অ্যান্টিবডি থেরাপি, সাপোর্টিভ কেয়ার।

বেশিরভাগ ভাইরাসজনিত রোগের ক্ষেত্রে **প্রতিরোধমূলক টিকা** গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিছু ভাইরাল সংক্রমণ নিরাময়যোগ্য, কিছু দীর্ঘমেয়াদে নিয়ন্ত্রণযোগ্য এবং কিছু শুধুমাত্র লক্ষণ উপশমের মাধ্যমে **চিকিৎসা** করা হয়। গবেষণা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে ভবিষ্যতে আরও কার্যকর প্রতিষেধক এবং ওযুধ আসবে।

ভাইরাসকে **বায়োলজিকাল ধাঁধা** বা **Biological Puzzle** বলা হয়, কারণ এটি জীবিত এবং নির্জীবের মধ্যে একটি বিতর্কিত অবস্থানে রয়েছে। জীববিজ্ঞানের সাধারণ সংজ্ঞা অনুযায়ী, জীবিত প্রাণীর কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য থাকে, যেমন—নিজে থেকে বংশবৃদ্ধি করা, কোষীয় গঠন থাকা, বিপাকীয় কার্যক্রম চালানো ইত্যাদি। কিন্তু ভাইরাস এই বৈশিষ্ট্যগুলোর কিছু মেনে চলে, আবার কিছু মেনে চলে না।

ভাইরাসকে বায়েলজিকাল ধাঁধা বলার কারণ:

১. জীবিত এবং নির্জীবের মধ্যে অবস্থান —ক) ভাইরাস **স্বাধীনভাবে** বেঁচে থাকতে পারে না, **এটি অপর একটি জীবের (হোস্টের) কোষে প্রবেশ না করলে জীবিত থাকে না**। খ) এটি **কোনো বিপাকীয়** (Metabolic) **কার্যক্রমের ধার ধারে না**, যেমন—শ্বাসপ্রশ্বাস বা খাদ্য পরিপাক। গ) তবে একবার এটি **হোস্ট কোষের ভেতরে প্রবেশ করলে** নিজেকে প্রতিলিপি (Replication) করতে পারে, যা জীবিত প্রাণীর একটি বৈশিষ্ট্য।

২. কোষের অনুপস্থিতি —ক) জীবজগতের অন্যান্য সব জীব (ব্যাকটেরিয়া, উদ্ভিদ, প্রাণী) **কোষ দ্বারা গঠিত**। খ) কিন্তু **ভাইরাসের কোনো কোষ থাকে না**, এটি শুধু **জেনেটিক উপাদান (DNA বা RNA) এবং প্রোটিন কোট (Capsid) দ্বারা তৈরি**। গ) কোষ ছাড়া কোনো জীবকে সাধারণত জীবিত বলা হয় না, তাই ভাইরাস একটি ব্যতিক্রম।

৩. বংশবৃদ্ধির অদ্ভুত পদ্ধতি — ক) সাধারণ জীবরা **নিজেদের কোষ বিভাজনের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে**। খ) কিন্তু ভাইরাস **স্বাধীনভাবে বিভাজিত হতে পারে না**, এটি **হোস্ট কোষ দখল করে তার রিবোজম ও অন্যান্য উপাদান ব্যবহার করে নিজের অনুলিপি তৈরি করে**।

গ) তাই ভাইরাসকে জীবের সংজ্ঞার বাইরে রাখা হয়, যদিও এটি বংশবৃদ্ধি করতে পারে।

৪. জীবাশ্ম বা বিবর্তনের ধাঁধা — ক) বিজ্ঞানীরা এখনো নিশ্চিত নন, ভাইরাস কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে। খ) কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন, ভাইরাস **বিবর্তনের আগের ধাপে থাকা এক ধরনের জীবনরূপ**। গ) অন্যরা মনে করেন, ভাইরাস একসময় কোষীয় প্রাণী ছিল, পরে **জীবনের খুবই সরল রূপে বিবর্তিত হয়েছে**।

৫. জেনেটিক উপাদানের স্বতন্ত্রতা — ক) ভাইরাসের কিছু কিছু **জেনেটিক উপাদান ব্যাকটেরিয়া বা প্রাণীদের থেকেও আলাদা**। খ) কিছু ভাইরাসের **RNA-ভিত্তিক জেনোম** থাকে, যা অন্য জীবদের সাধারণত থাকে না। গ) এই কারণে ভাইরাসকে কখনো কখনো জীবজগতের সাধারণ নিয়মের বাইরে রাখা হয়।

উপসংহার --- মানুষ মহাকাশে উপনিবেশ গড়ার দোরগোড়ায়। একটি বোতাম টিপে সারা বিশ্বকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার কুবুদ্ধি এখন মানুষের মগজে। একরত্তি ভাইরাস জীবাণুকে কিন্তু সে এখনও কব্জা করে উঠতে পারল না। তাই বলছিলাম অর্ধেক কল্পনার সঙ্গে কি আর যুদ্ধে পেরে ওঠা যায়? উমা

বিজ্ঞান দিবস ও বদলে যাওয়া চালচিত্র — পর্ব ১

রূপালী গঙ্গোপাধ্যায়

২৮ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিনটি ভারতবাসীর কাছে খুবই গর্বের। বিজ্ঞানে একমাত্র নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী সি ভি রমন ১৯২৮ সালের এই দিনে তাঁর বিখ্যাত 'রমন এফেক্ট' আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেছিলেন, যার জন্য পরের বছরই (১৯৩০) তিনি নোবেল পুরস্কার পান। ভারতীয় বিজ্ঞান সারণিতে এই দিনটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয়। ১৯৮৬ সাল থেকে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সঞ্চার নিগম (এনসিএসটিসি) এই দিনটাকে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস বলে ঘোষণা করেছেন। এই দিনটাকে বিজ্ঞান দিবস হিসেবে পালন করার কথা যাঁর মাথায় এসেছিল, তাঁকে অনেক ধন্যবাদ, বিজ্ঞানী যে তাঁর কাজের জন্যই মনে থাকেন সেই কথাটি এই দিনের মধ্যে দিয়ে স্মরণ করানোর জন্য। ১৯৯৯ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারি উদ্যোগে শুরু হয়েছে বিজ্ঞান দিবসের 'থিম' অর্থাৎ একটি কেন্দ্রীয় ভাবনাকে সামনে রেখে বিজ্ঞান দিবস উদযাপনের পরিকল্পনা করা। বিজ্ঞান দিবসের প্রথম দিককার কয়েকটি থিমের দিকে তাকালে দেখব ১৯৯৯ সালের থিম ছিল 'আওয়ার চেঞ্জিং আর্থ' (আমাদের বদলে যাওয়া পৃথিবী), ২০০২ সালে 'ওয়েলথ ফ্রম ওয়েস্ট (বর্জ্য থেকে সম্পদ আহরণ), ২০০৫ সালে থিওরি অফ রিলেটিভিটির শতবর্ষ উপলক্ষে 'সেলিব্রেটিং ফিজিক্স' (পদার্থবিজ্ঞানের উদযাপন) আর ২০১৪ সালে 'ফস্টারিং সায়েন্টিফিক টেম্পার' (বিজ্ঞানচেতনার লালন)। অর্থাৎ তখন পর্যন্ত বিজ্ঞান ভাবনার সঙ্গে 'দেশসেবা'র ততটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ছিল না। ২০১৫ সাল থেকে বিজ্ঞান দিবসের থিম-এর তালিকায় চোখ রাখলেই বোঝা যাবে যে দেশের রাজনৈতিক চালচিত্রে একটা বদল এসেছে। ২০১৫ সালে 'সায়েন্স ফর নেশন বিল্ডিং' থেকে শুরু করে প্রায়ই বিজ্ঞান দিবসের থিমে জাতীয়তাবাদের ছোঁয়া লাগতে দেখা যাচ্ছে, মানে বিজ্ঞানকে নৈর্ব্যক্তিক অবস্থান থেকে সরিয়ে এনে 'দেশের কাজে' লাগাবার কথা মনে করানো হচ্ছে। তাই ২০১৫ সাল থেকে শুরু করে এক একটি থিম এবং তার যথার্থতা বিষয়ে কিছু বিশ্লেষেণ নিয়ে এই লেখা।

১. জাতিগঠনে বিজ্ঞান (২০১৫,২০১৬) —ছোটবেলায় রচনা লিখতে হত বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ, আর আমরা পাতা ভরে লিখতাম বিজ্ঞান আমাদের কি কি দিয়েছে, সকালে ঘুম থেকে ওঠা থেকে রাত্তিরে শুতে যাওয়া অবধি সারাক্ষণ আমরা নিজের জীবনযাত্রার নানা উপকরণে বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিকগুলোকে কিভাবে ব্যবহার করে চলি, সেই কথা। নম্বরও পেতাম মোটামুটি কিন্তু তখন বুঝি নি যে বিজ্ঞান বলতে আমরা যা বোঝাচ্ছি তা আসলে হল প্রযুক্তি। ওই রচনায় আমরা বিজ্ঞানের কথাও লিখতাম কিন্তু সে কথা একেবারেই গৌণ ছিল। শুনলাম এখনও মাধ্যমিক পরীক্ষায় নাকি এই রচনা লিখতে বলা হয়, অর্থাৎ সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে।

২০১৫ সালের বিজ্ঞান দিবস উদযাপনের 'থিম' ছিল 'জাতিগঠনে বিজ্ঞান' (সায়েন্স ফর নেশন বিল্ডিং)। আর ২০১৬ সালের থিম ছিল 'ভারত গড়ো (মেক ইন ইন্ডিয়া)ঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চালিত প্রয়োগ-কৌশল (ইনোভেশন)'। প্রয়োগ-কৌশল বিষয়টাই এমন যে জাতিগঠনের জন্য দরকারি যাবতীয় প্রয়োগ-কৌশল অবধারিতভাবেই বিজ্ঞান-প্রযুক্তি থেকে উদ্ভূত হবে। সে কথা আলাদা করে উল্লেখ করার খুব একটা যুক্তি নেই। এই সময় থেকেই সরকারি উৎসাহে একদিকে রমরমিয়ে উঠেছে প্রাচীন ভারতের গৌরবগাথার নামে অপবিজ্ঞানের প্রচার, অন্যদিকে তাকে স্পষ্টভাবে 'কাজে লাগার বিষয়ে' পরিণত করার চেষ্টা শুরু হয়েছে, থিম-এর শিরোনাম থেকেই সেটা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞান কি, সেই ধারণাই যদি পরিস্কার না থাকে আর বিজ্ঞান যে অভিশাপ নয় আজও যদি এই প্রমাণ দিয়ে যেতে হয়, তবে বিজ্ঞানচেতনার উন্নয়নই বা হবে কি করে আর তাকে জাতীয় বা দেশীয় গঠনকার্যে ব্যবহারই বা করা যাবে কিভাবে!

ছোটবেলার সেই রচনায় কোথাও না কোথাও একবার লিখতাম, যাবতীয় ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত যে নিয়ম, কার্যকারণ সম্পর্কে যে বিশেষ জ্ঞান, তাই হল বিজ্ঞান; সেই হিসেব মতো বিজ্ঞানচেতনার গোড়ার কথাই হল বুঝতে শেখা, প্রশ্ন করতে শেখা আর যে কোনো অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতন হওয়া। কিন্তু এই কথাটা শুধু রচনাতেই নয় আমাদের জীবনেও পরবর্তীকালে এমন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে যে সারাজীবন বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেও আমরা সঠিকভাবে যুক্তিবাদী বা বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে উঠতে পারি না।

কিন্তু যাঁরা বিজ্ঞানমনস্কতার মানে বোঝেন, যাঁরা সত্যিই লোককে যুক্তিবাদী হয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারেন আমাদের দেশে তাঁদের ভবিষ্যৎ খুব ভাল নয়। এইরকম একজন যুক্তিবাদী প্রবীণ মানুষ গোবিন্দ পানসারে গত ২০১৫ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি খুন হয়ে গেলেন আততায়ীর গুলিতে। বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী এই মানুষটি সারাজীবনে মার্কসবাদ ছাড়াও বিশ্বায়ন, সংরক্ষণ, কৃষি ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে কলম ধরেছেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় কাজ হল ছত্রপতি শিবাজীর নতুন মূল্যায়ন করা; তিনি শিবাজীকে শুধুমাত্র হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে না দেখে তাঁকে একজন প্রজাদরদী ও ধর্মনিরপেক্ষ সুশাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এতে শিবাজীর গরিমা বেড়েছে অনেক কিন্তু হিন্দু ধর্মোন্মাদদের স্বার্থের পক্ষে সেটা ভালো হয় নি। তাই আততায়ীর গুলি ৮২ বছরের বৃদ্ধকেও ছাড়ল না। এই মৃত্যুর দেড় বছর আগে ২০১৩ সালের ২০ অগাস্ট, সকাল ৭-২০ নাগাদ প্রাতঃভ্রমণ সেরে ফেরার পথে আততায়ীর গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিলেন আর একজন যুক্তিবাদী মানুষ, প্রবীণ মারাঠি চিকিৎসক ড. নরেন্দ্র দাভোলকর। আরও একবার প্রমাণিত হয়েছিল বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে আজও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কথা বলার মূল্য দিতে হয় জীবন দিয়ে।

ভারতরত্ন পাওয়ার শুভক্ষণে বিজ্ঞানী সি এন আর রাও বলেছিলেন যে, বিজ্ঞানচর্চাই দেশের ভবিষ্যত উজ্জ্বল করতে পারে কিন্তু সেই দিকে সরকারের নজর (মানে অনুদান) যথেষ্ট নয়। তাছাড়াও বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর মুখে মাঝে মাঝেই একটা কথা শোনা যায় যে, ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে যথেষ্ট সংখ্যায় মেধাবী গবেষক পাওয়া যাচ্ছে না, যে কারণে ভারতের বিজ্ঞান গবেষণার সার্বিক মানের উন্নয়ন হচ্ছে না। এই দুটো মন্তব্যকে ঘিরেই সময়ে সময়ে কিছু উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে, স্বপক্ষে-বিপক্ষে অনেক রকম মতামত পাওয়া গেছে, কিন্তু এইরকম একটা সংশয় কেন উঠে আসে সেটা একটা ভাবার বিষয় হয়ে রয়ে গেছে অনেকের মনে।

যেহেতু বিজ্ঞানীদের বাদ দিয়ে বিজ্ঞানচর্চা এগিয়ে যেতে পারে না, তাই বিজ্ঞানচর্চার ভালোমন্দের সূত্রেই উঠে আসে একটা সাধারণ প্রশ্ন : কেমন আছেন ভারতের বিজ্ঞানীরা! এই প্রশ্নের উত্তরে সরকার এক কথায় বলবেন, খুব ভাল। দেখিয়ে দেবেন দেশ জুড়ে নতুন তৈরি হওয়া বেশ কিছু বিজ্ঞান-প্রযুক্তি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আর শুনিয়ে দেবেন গত কয়েক বছরে চালু হওয়া কিছু গবেষণা প্রকল্পের, বৃত্তির কথা। সে সব সত্যি কথাই কিন্তু তবুও এই প্রশ্নের উত্তর এককথায় দেওয়া যাবে না। কারণ ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে নানারকম শ্রেণীবৈচিত্র্য (এবং শ্রেণীবৈষম্য) রয়েছে। আর কে না জানে সমস্ত সুযোগ সুবিধে কোনোদিনই সকলে জন্য সমানভাবে থাকে না। অথচ এই কথা তো সত্যি যে বিজ্ঞান গবেষণায় সার্বিকভাবে উন্নত করতে হলে, দেশে পি এইচ ডি-র সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে বাড়াতে গেলে গবেষণার প্রসার সব স্তরেই হতে হবে।

কিন্তু শুধুমাত্র একজন বিজ্ঞানীই বিজ্ঞান গবেষণার প্রথম ও শেষ কথা হতে পারেন না। বরং বিজ্ঞানের গবেষণায় আন্তর্জাতিক মানের কাজ করতে গেলে যন্ত্রপাতি ও পরিকাঠামোর ওপর অনেকটাই নির্ভর করতে হয়। আর সরকারি বিচারে সেইখানে এসে বিজ্ঞানীর চেয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠান বড় হয়ে ওঠে। সরকারি গবেষণাগারে যাঁরা কাজ করেন, ভারতীয় বিজ্ঞান সমাজে তাঁদের স্থান উচ্চে, সরকারি অনুদান, গবেষণা বৃত্তির সিংহভাগ, অন্যান্য হাজারো সুযোগ-সুবিধে আসে সেখানে (এই কথায় একমত হয়েছেন কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরাও)। স্বাভাবিকভাবেই ভাল ছাত্ররা সেখানেই কাজ করতে চায়। আর ঝাঁকে ঝাঁকে মেধাবী ছাত্র যেখান থেকে তৈরি হয়, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগার পরিকাঠামোর অভাবে পিছিয়ে পড়ে। আর সেটা যদি কলেজ হয় তবে তো অবস্থা আরো করুণ, সেখানে চেষ্টা করেও কোনো অনুদান আদায় করা প্রায় অসম্ভব। সোজা কথায়, পরিকাঠামো যেখানে উন্নততর, অনুদানের প্রাচুর্য সেখানেই, যেখানে পরিকাঠামো যত দুর্বল সেখানে সাহায্যও তত ক্ষীণ।

তাই যে প্রশ্নটা দিয়ে শুরু করেছিলাম, তার উত্তরে বিভিন্ন পর্যায়ের বিজ্ঞানীরা ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দেবেন। নিজের গবেষণা শেষ করে (হয়ত বিদেশ ঘুরে এসেও) যাঁরা গবেষণা কেন্দ্রে চাকরি পেয়েছেন, তাঁরা যেরকম আছেন, যাঁরা কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে শুরু করেছেন তাঁরা অনেকটাই অন্যরকম আছেন। ঠিক এইজন্যই আর এই যদি চিত্র হয় তা হলে আমরা কিভাবেই বা আশা করতে পারি যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তরুণ মেধাবী গবেষক বেরিয়ে আসবেন! ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু রিচার্ড ফাইনম্যানের কথা তো ভুলতে পারি না যে 'ব্যতিক্রমই প্রমাণ করে যে নিয়মটা আসলে ভুল!' এমনিতে তো আমরা বিজ্ঞানচর্চা আর গবেষণায় আকাশ-পাতাল তফাত করেই রেখেছি, তার ওপর বিজ্ঞানের গবেষণার মূলধনও যদি এতটা অবৈজ্ঞানিকভাবে ভাগ-বাটোয়ারা হয়, তবে আর গবেষণার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হবে কি করে আর বিজ্ঞানকে দেশের গঠনের

কাজে সর্বাঙ্গীণভাবে ব্যবহারই বা করা যাবে কিভাবে?

২. বিজ্ঞানদিবস ২০১৯, ২০২০: 'বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই চড়ি শখের বোটে' ...তারপরের কথা সকলেরই জানা। পদে পদে মাঝিকে প্রশ্নে প্রশ্নে নির্বোধ প্রমাণ করার পর বাবুমশাই নিজে শেষকালে প্রায় ডুবে মরেন। এই গল্পের (মানে কবিতার!) শেষে বেশিরভাগ মানুষের সমর্থন যায় মাঝির দিকে, কারণ তাঁর জ্ঞানটা কাজে লাগে আর অহঙ্কারী বাবুমশাই-এর ওই 'কেন' 'কি করে' জাতীয় জ্ঞানবুদ্ধি বাস্তবে কোনো কাজে লাগতে দেখা যায় না। কিন্তু সব যুগেই বাবুমশাইয়ের (অহঙ্কারটুকু বাদে) মতো কিছু মানুষ যদি না থাকেন তা হলে বিজ্ঞানের পড়াশোনা বন্ধই হয়ে যাবে। কারণ, ওই 'কেন' আর 'কি করে' প্রশ্নই হল বিজ্ঞানের বিজ্ঞানের গোড়ার কথা আর মাঝি এসব না জেনেও ঢেউকে সামলাতে পারেন, তার পেছনেও আছে বিজ্ঞানের নিয়মের সঠিক ব্যবহার। ঠিক যেমন আপনি লীন তাপের তত্ত্ব না জেনেও গরমকালে মাটির কলসিতে জল রাখেন, ফ্যানের হাওয়া খান, চাপের সঙ্গে স্ফুটনাঙ্কের সম্পর্ক না জেনেও ভাতের হাঁড়িতে ঢাকনা দেন, সেরকমই। অর্থাৎ সব কিছুর পেছনেই আছে বিজ্ঞানের নানারকম তত্ত্ব ও তার প্রয়োগের ব্যাপার। আর আপনি চান বা না চান বিজ্ঞানের হাত এত লম্বা (আইনের হাতের চেয়েও!) যে আপনি তার বাইরে যেতে পারবেনই না।

২০২০ সালে বিজ্ঞান দিবসের থিম ছিল 'বিজ্ঞানে নারী (Women in Science)'। কথাটা জেনে নারী হিসেবে আমার হয়ত খুশি হওয়া উচিত ছিল কিন্তু বিষয়টা আমার কিঞ্চিৎ গোলমেলে ঠেকেছে। কারণ এই থিম অনুসারে বিজ্ঞান বলতে সম্ভবত পেশাগত বিজ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে; সেই বিশেষ ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে যে চিন্তাভাবনা হচ্ছে, সে ভাল কথা। কিন্তু বিজ্ঞান দিবসের পালনের মুখ্য উদ্দেশ্য হল সার্বিকভাবে বিজ্ঞান চেতনার উন্নতি, কার্যকারণ সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে প্রতিনিয়ত বিজ্ঞানকে অনুভব করা, তার জন্য ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-বিজ্ঞানী কিছুই হবার দরকার নেই, শুধু একটু যুক্তিবাদী হতে হবে। বিজ্ঞান হল ব্যক্তিনিরপেক্ষ এক সত্য যা নানারকম নিয়মকানুনের মধ্যে দিয়ে আপনিই প্রকাশিত হয়; মানুষ তাকে আবিষ্কার করতে পারে, ব্যবহারও করতে পারে, কিন্তু সৃষ্টি বা ধ্বংস করতে পারে না। তাই বিজ্ঞান অভিশাপ বা আশীর্বাদ কিছুই হতে পারে না, আপনার জানা-না-জানা, বিশ্বাস করা বা না করার ওপর তার অস্তিত্ব নির্ভর করে না। মৌমাছির চাকের ছ'কোণা খোপে, সূর্যমুখীর বীজের প্যাঁচানো বিন্যাসে, আপনার চেতনার রঙে সবুজ বা লাল হয়ে ওঠা পান্না-চুনির দ্যুতিতে সর্বদাই আছে কিছু কেন'র উত্তর; সেই উত্তরের নামই বিজ্ঞান। মানুষের মুখের স্বতঃস্ফূর্ত ভাষা যেভাবে বদলায়, প্রতিটি ছন্দ যেভাবে আলাদা আলাদাভাবে কানে ধরা দেয়, যেভাবে ঋতু বদলায়, মানুষের জীবনযাত্রা বদলায় তার সবের পেছনেই আছে নিজস্ব নিয়ম অর্থাৎ বিজ্ঞান। প্রতি পদে এইভাবে বিজ্ঞানের অস্তিত্বকে মনে করিয়ে দেওয়ার দিন হল বিজ্ঞান দিবস, যাতে বছরের বাকি দিনগুলোতেও আমরা বিজ্ঞানকে সঙ্গে নিয়েই চলি। এক একটা মিথ্যে বারবার উচ্চারণ করতে করতে সত্যি হয়ে ওঠে। যেমন আইনস্টাইনের কথা থেকে কিছুটা অংশ তুলে নিয়ে অনেকেই বোঝাতে চান যে, উনি নাকি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন! তা করতেই পারেন, তবে সেই কথাটা আপনি বিশ্বাস করার আগে একটু দেখে নিন ভদ্রলোক নিজে কি বলেছেন। 'আমি সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করি যিনি যাবতীয় সুচারু ছন্দ ও নিয়মের মধ্যে প্রকাশিত হন, যিনি মানুষের ভাগ্য ও কর্ম নিয়ন্ত্রণ করেন সেই ঈশ্বরে নয়।' অতএব হরেদরে বিশ্বাস নয়, সেই নিয়মের কাছেই পৌঁছনো। তাই ভূতপ্রেত, তাবিজকবচ, জ্যোতিষ-গ্রহরত্ন যাতেই বিশ্বাস করবেন, কেন করবেন, কি করে কাজ করে জেনে নিয়ে করুন। কিছু সত্যি কথাকে আবার বারবার মনে করিয়ে দিয়েও সত্যি করে তোলা যায় না। যেমন ভারতীয় সংবিধানের 'ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস অ্যাক্ট (১৯৫৪)' অনুসারে ওই তাবিজ-কবচ আরো যা যা বললাম সেগুলোর প্রচার করা অন্যায় আর হ্যাঁ গণতন্ত্রের সেপাই হিসেবে 'যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞানচেতনার উন্মেষে সাহায্য করা' আপনারও সাংবিধানিক দায়িত্ব। সেদিক দিয়ে ২০১৯ সালের থিম 'মানুষের জন্য বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের জন্য মানুষ' অনেকটা যথাযথ। মানুষের জন্য বিজ্ঞান সে তো জানাই ছিল, কিন্তু বিজ্ঞানের জন্যও মানুষ, কথাটা মেনে চলতে পারলে ভালই (তবে সেই বছরই আবার বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে সরাসরি গণেশের মাথাকে প্রাচীন ভারতে প্লাস্টিক সার্জারির উদাহরণ ইত্যাদি বলা হল তো!)।

কিন্তু কোথায় সেই বিজ্ঞানচেতনা! এই সেদিনও পড়লাম সাপে কামড়ানোর পর দুটি শিশুকে হাসপাতালের বদলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওঝার কাছে। পরিণাম মৃত্যু। কিছুদিন আগে দেখলাম একদল শিক্ষিত (!) তরুণ-তরুণী রীতিমতো অস্ত্রশস্ত্র (মানে যন্ত্রপাতি) নিয়ে ভূত ধরতে বেরিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা যা দেখালেন তা হল ভূত একটি কঠিন তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গে (অর্থাৎ সোনার পাথরবাটি) যা কোনোভাবে মাধ্যমকে উষ্ণ করে তোলে। এই দুটি ক্ষেত্রেই যাঁরা কাজটা করছেন আর যাঁরা তাকে সমর্থন করছেন কারো

মনে কোনো প্রশ্ন আসে নি যে 'কি করে হল/হবে!' এমন যুক্তিহীন বিশ্বাসেই লোকে গোরুর দুধে সোনা, ময়ূরের অশ্রুতে গর্ভধারণ, গণেশের প্লাস্টিক সার্জারি, রামলালার জন্মভূমি, দেশদ্রোহিতা, ভারতের মুসলিম রাষ্ট্র হয়ে যাওয়া ইত্যাদি যাবতীয় কষ্ট কল্পনাকেই সত্যি বলে মনে করে। তাই বিজ্ঞানমনস্ক হতে গেলে অলৌকিকে বিশ্বাস বাদ দিয়ে যে কোন ঘটনা কেন ঘটছে আর কিভাবে ঘটছে জানতে চাইতে হবে।

এইভাবে যিনি আমাদের বিজ্ঞানচেতনার পাঠ দিয়েছেন ২০২০ সালেই তাঁর জন্মের দু'শো বছর পূর্ণ হল। তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), যাঁর লেখা চারুপাঠকে (১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ) বাঙলায় বিজ্ঞানচর্চার প্রথম মাইলফলক বলা যায়। তাঁর সতীর্থ ঈশ্বরচন্দ্রকে আমরা বিপুলভাবে মনে রাখলেও, অক্ষয়কুমারকে আমরা বিশেষ মনে রাখি নি। নাহলে এই বছর অন্তত বিজ্ঞানদিবসের কাছাকাছি তাঁর বিজ্ঞানভাবনা নিয়ে কিছু আলোচনা হতে দেখা যেত। তাঁর নির্দেশ করা পথে চললে আমাদের বিজ্ঞানসচেতনতা এতদিনে অন্তত সাবালক হয়ে উঠতে পারত।

বিজ্ঞান দিবসের থিমের তালিকা:

১৯৯৯: আমাদের বদলে যাওয়া পৃথিবী। ২০০০: মৌলিক বিজ্ঞানে আগ্রহের পুনর্জাগরণ ঘটানো। ২০০১: বিজ্ঞান শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার। ২০০২: বর্জ্য থেকে সম্পদ। ২০০৩: ডি এন এ-র ৫০ বছর আর আইভিএফ-এর পঁচিশ বছর : জীবনের নীল নকশা। ২০০৪: সমাজে বিজ্ঞান সচেতনতার উন্মেষের প্রচেষ্টা। ২০০৫: পদার্থবিজ্ঞানের উদযাপন। ২০০৬: ভবিষ্যতের জন্য প্রকৃতিকে লালন। ২০০৭: প্রতি ফোঁটায় আরো শস্য। ২০০৮: পৃথিবী নামক গ্রহটিকে চিনে নেওয়া। ২০০৯: বিজ্ঞানের প্রসারণশীল দিগন্ত। ২০১০: সুস্থায়ী ভবিষ্যতের জন্য লিঙ্গসাম্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। ২০১১: রোজকার জীবনে রসায়ন। ২০১২: দূষণহীন শক্তি ও নিউক্লীয় শক্তি। ২০১৩ : জিন বদলানো শস্য ও খাদ্য সুরক্ষা। ২০১৪: বিজ্ঞানচেতনার পালন। ২০১৫: জাতিগঠনে বিজ্ঞান। ২০১৬: ভারত গড়ো: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চালিত প্রয়োগ কৌশলগুলি। ২০১৭: বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। ২০১৮: সুস্থায়ী ভবিষ্যতের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। ২০১৯: মানুষের জন্য বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের জন্য মানুষ। ২০২০: বিজ্ঞানে নারী। ২০২১: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভবিষ্যত শিক্ষা, কাজ ও দক্ষতার ওপর প্রভাব। ২০২২: সুস্থায়ী ভবিষ্যতের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মেলবন্ধন। ২০২৩: সর্বমঙ্গলে বিজ্ঞান। ২০২৪: ভারতের বিকাশের জন্য দেশীয় প্রযুক্তির ব্যবহার। ২০২৫: ভারতের বিকাশের প্রয়োজনে বিজ্ঞান ও প্রয়োগমুখী উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বিশ্বের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তরুণ সমাজকে শক্তিশালী করে তোলা।

(দ্বিতীয় পর্বে সমাপ্ত) উমা

(১৪ পাতার পর)

মাত্রায়। এই স্তরের ঘুম যত বেশি হয় ততই ভাল। 'রেম' ঘুমে কেবল শ্বাস নেওয়ার জন্য মধ্যচ্ছদা (diaphragm) ও চোখ নাড়ানোর জন্য পেশি (extra-occular muscles) ছাড়া শরীরের সমস্ত পেশি শিথিল হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এই কারণেই 'রেম' ঘুমে আমাদের শরীরের ক্লান্তি দূর হয় সবচেয়ে বেশি। এই ঘুমের বৈশিষ্ট্য — একসাথে চোখ দুটো দ্বৈত-ছন্দে (conjugate), দ্রুত (rapid) ও বেতালে (irregular) নাচতে থাকে। এই বৈশিষ্ট্য থেকেই ঘুমের দুটো স্তরের নামকরণ — এনারেম ঘুম (Non-rapid eye movement sleep) ও রেম ঘুম (Rapid eye movement sleep)। 'রেম' ঘুম আমাদের সবচেয়ে উপকারী ঘুম। মদ, অনিদ্রা ও মানসিক অবসাদের ওষুধ খেলে 'রেম' ঘুম ব্যাহত হয়।

তৃপ্তির ঘুমে অতিরিক্ত লাভ আছে--- স্বাস্থ্য ঘুমের দীর্ঘমেয়াদি সুফল স্বরূপ হৃদরোগ নিবারণের সঙ্গে সঙ্গে হাতে গরম কিছু প্রাপ্তিযোগও ঘটে। (১) দিনের শুরুতে শারীরিক ও মানসিক শক্তির নবীকরণ। (২) শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি। (৩) ক্ষয়িষ্ণু ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের অপ্রয়োজনীয় তথ্য বর্জন করে ব্যবহারযোগ্য তথ্য সংরক্ষণ করে মস্তিষ্কের স্মরণশক্তি বৃদ্ধি।

বয়স বাড়ার সঙ্গে, অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মে 'এনারেম' ঘুমের শেষ স্তর 'এনারেম-৩', অর্থাৎ গভীর ঘুমের স্তর কমতে থাকে,সমানুপাতে বাড়তে থাকে 'এনারেম' ঘুমের প্রথম স্তর 'এনারেম-১'। 'রেম' ঘুমের অংশ খুব একটা পরিবর্তিত হয় না। কম পরিমাণের তৃপ্তিদায়ক ঘুমের কারণ হিসেবে তৃপ্তিদায়ক ঘুমের কারণ হিসাবে বুড়ো বয়সে কাজ করতে হয় না, বা করা যায় না বলে একটা অজুহাত খাড়া করা হয়। বলা হয় বৃদ্ধ বয়সে কম খাটুনির জন্য কম সময়ের ও নিকৃষ্ট মানের ঘুম স্বাভাবিক। এর স্বপক্ষে কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নেই, নেই কোনো তথ্য। ঘুমের ওষুধে আত্মসমর্পণ করতে হয় অনেক প্রবীণ নাগরিককেই। ঘুমের ওষুধে মনে রাখার ক্ষমতা কমে যায়। বুড়ো বয়সে ঘুম-সুখের জন্য স্মৃতিশক্তির দাম কতটা দেবেন সেটা হিসেব করেই দেবেন।

সূত্র ঃ ১। https://timesofindia.indiatimes.com/india/who-use-low-sodium-salt-to-reduce-heart-attack-risk/articleshow/118130308.cms

২। https://www.utsomanush.com/Magazines/UM-Patrika-Apr-Jun2014.pdf

উমা

ধর্ম, জাদু এবং বিজ্ঞানের ধারণার পুনর্বিবেচনা

রুণা দাশচৌধুরি

ধর্ম এবং রিলিজিয়ন সমার্থক নয়। আসলে রিলিজিয়ন শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ নেই। যেমন হিন্দুধর্ম বললে যা বোঝায় তা রিলিজিয়ন নয়, কিন্তু বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মধর্মকে রিলিজিয়ন বলা চলে। ক্রিড অর্থাৎ নির্দিষ্ট বিশ্বাস বা মূলমন্ত্র না থাকলে রিলিজিয়ন হয় না। এ নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যায় এখন ঢুকছি না, শুধু জানাই, এখানে রিলিজিয়নকেই ধর্ম অর্থে ব্যবহার করছি। হাজার হাজার বছর ধরে 'ধর্ম' শব্দটির অর্থ ছিল অতিপ্রাকৃতের উপাসনা। এমনকি এক শতাব্দী আগে পর্যন্ত, সমাজবিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন, এই সংজ্ঞাটি যথেষ্ট। তার পরেও ধর্মের সংজ্ঞার অন্ত নেই! জন মোরলে 'অন কম্প্রোমাইজ' গ্রন্থে বলেছেন, 'কথিত আছে ধর্মের দশ হাজার রকম সংজ্ঞা আছে।' এটা একটু বাড়াবাড়ি রকমের মন্তব্য হলেও বহু বিচিত্র সংজ্ঞা যে আছে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। ব্রিটিশ নৃতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা এডওয়ার্ড বার্নেট টাইলার (প্রিমিটিভ কালচার) ধর্মকে 'অতীন্দ্রীয় সত্তায় বিশ্বাস' বলে মনে করতেন। বলতেন, মানব সংস্কৃতির বিবর্তনের কোনো এক স্তরে পাহাড়, নদী, গাছ, মেঘ ইত্যাদি প্রাকৃতিক বস্তুগুলিকে মানুষ তার নিজের মতো সজীব বলে মনে করত। এদের উপর নিজের ব্যক্তিত্ব ও অভিজ্ঞতাও আরোপ করত। কল্পনা করত, তার ক্রিয়া-কলাপ যেমন তার নিজের ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয়, সেরকমই প্রাকৃতিক বস্তুগুলির ক্রিয়াকলাপের মূলেও তাদের ইচ্ছা কাজ করে। টাইলার মনে করতেন এই ধরনের প্রাণবাদী ধারণাকে ভিত্তি করেই আদিম মানবের জীবনে ধর্মের আবির্ভাব। অনেকের মতে 'টোটেম' পূজাই পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম। প্রাচীন আদিবাসীদের অনেকেই কিছু প্রাণী বা উদ্ভিদ, কখনও জড়বস্তুকেও তাদের সমগোত্রীয় মনে করত। এমনকি পূর্বপুরুষ বলেও বিশ্বাস করত। টোটেম অনুযায়ী হত তাদের গোত্রের নামকরণ। আমাদের হনুমান পুজোকে অনেকে টোটেম বলে মনে করেন। মনোবিজ্ঞানী সিগমুণ্ড ফ্রয়েড তাঁর 'টোটেম অ্যান্ড টাবু' বইতে এই দুটো নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করে শেষে ধর্মকে অসার, অবাস্তব ও কাল্পনিক বলেছেন। তাঁর মতে ধর্মপ্রাণতা অস্বাভাবিক মনের পরিচায়ক। ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খহাইমের মতে, এখন যে সব ধর্মবিশ্বাসের সন্ধান সম্ভব, টোটেমবাদ তাদের মধ্যে সহজতম এবং সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তার পরেও ধর্মের যে সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন তা মোটেও সরল নয়। 'এলিমেন্টারি ফর্মস অফ রিলিজিয়াস লাইফ' (১৯১২) গ্রন্থে ধর্মকে 'পবিত্র জিনিসের সঙ্গে সম্পর্কিত বিশ্বাস ও অনুশীলনের একটি একীভূত ব্যবস্থা' হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। মজার ব্যাপার, তাঁর কোনও লেখাতেই কোথাও 'পবিত্র' বলতে কী বলতে চেয়েছেন, জানান নি। সেই মত অনুযায়ী ধর্ম হল জীবনের অর্থ এবং উদ্দেশ্য বিষয়ক প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত বিশ্বাস ও অনুশীলনের যে কোনও ব্যবস্থা। এই সংজ্ঞার প্রবক্তারা খোলাখুলি স্বীকার করেন, 'ধর্ম অবশ্যই মানবজীবনের চূড়ান্ত সমস্যাগুলি মোকাবিলা করার প্রচেষ্টায় একা নয়।' প্রকৃতপক্ষে অধার্মিক, এমনকি ধর্মবিরোধী দর্শনও প্রায়শই জীবনের অর্থকে চিহ্নিত করে।

একইভাবে, ইন্দ্রজাল বা জাদু শব্দটিও বেশ গোলমেলে। এ প্রসঙ্গে জানাই, এই জাদু বা ইন্দ্রজাল হোকাস পোকাস, গিলি গিলি গে-মার্কা জাদু নয়। এটি এক ধরনের ছদ্মবিজ্ঞান (সিউডোসায়েন্স)। ধর্মের মতো এর মূলেও আছে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস। অতি প্রাচীনকাল থেকেই ধর্মের সঙ্গে ইন্দ্রজালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আদিম সংস্কৃতিতে ঐন্দ্রজালিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ফারাক করা যায় না। তবে কে আগে এবং কার থেকে কার উদ্ভব, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। 'মানা'-কে (রহস্যময় নৈর্ব্যক্তিক শক্তি) মানুষ কখনও উদ্ধতভাবে বাধ্য করবার চেষ্টা করেছে তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য, আবার কখনও বা তাকে তুষ্ট করবার চেষ্টা করেছে পূজা ও প্রার্থনার মাধ্যমে। উভয় ক্ষেত্রেই মানুষ তার জীবনযুদ্ধে অতীন্দ্রীয় রহস্যময় শক্তির সাহায্য চেয়েছে। অতীন্দ্রীয় সাহায্য চাইলেও দুটি ক্ষেত্রে তার প্রতি মানুষের মনোবৃত্তির পার্থক্য লক্ষণীয়। এই কারণেই ইন্দ্রজাল ও ধর্মে পার্থক্য রয়েছে। ইন্দ্রজালের কাজ ছিল কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তিকে মানুষের কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োগ করা। এর দুটো বৈশিষ্ট্য, অতিপ্রাকৃত শক্তি ও কার্য-কারণ নীতিতে বিশ্বাস। তবে ঐন্দ্রজালিক কার্য-কারণ ঠিক বৈজ্ঞানিক কার্য-কারণ নয়। এটি ভাবানুষঙ্গ-নির্ভর, এর ভিত্তি কল্পনা। তাই ইন্দ্রজালে প্রতীকের ব্যবহার বিশেষভাবে

লক্ষণীয়। বিস্ময়ের ব্যাপার, বহু পণ্ডিত জাদুবিদ্যা সম্পর্কে লিখলেও এটির সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন নি। যেমন, ম্যাক্স ওয়েবারের বইগুলি জাদুবিদ্যা নিয়ে হলেও তিনি তার সংজ্ঞা দেন নি। একইভাবে ব্রায়ান উইলসন 'ম্যাজিক অ্যান্ড দ্য মিলেনিয়াম' (১৯৭৫) শিরোনামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু পাঠকদের এই শব্দের অর্থ জানানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন নি। কিছু পণ্ডিত জাদু এবং ধর্মকে সমান বলে গণ্য করেছেন এবং 'জাদু-ধর্মীয় কাজ এবং বিশ্বাসের' কথা উল্লেখ করেছেন। আবার অনেকে ডুর্খহাইমকে অনুসরণ করেছেন। ধর্মকে জাদু থেকে আলাদা করার ক্ষেত্রে, ধর্মকে প্রধানত সাধারণ, দীর্ঘপ্রসারী লক্ষ্য এবং জাদুকে তাৎক্ষণিক লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে চিহ্নিত করেছেন।

ইতিহাসবিদ, দার্শনিক এবং সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে, পশ্চিমে যে 'বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা' উদ্ভূত হয়েছিল, তা মধ্যযুগীয় ইউরোপ, আরব, চীন বা ভারতীয় পূর্বসুরিদের থেকে আলাদা। লক্ষণীয়, চীন, আরব, ভারত, সেইসঙ্গে প্রাচীন গ্রিস এবং রোমে একটি অত্যন্ত উন্নত রসায়ন ছিল। কিন্তু, শুধুমাত্র ইউরোপে রসায়নে অ্যালকেমি বিকশিত হয়েছিল। এই ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তটিই জাদুবিদ্যাকে আদিম বিজ্ঞান বলে মনে করার একটি ভিত্তি গড়ে দেয়। বিপরীতে, এই দাবিও যথেষ্ট জোরালো, ধর্ম থেকে বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে। খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্বের মৌলিক স্বতঃসিদ্ধ ধারণা, ঈশ্বর সার্বজনীন নিয়মের উপর ভিত্তি করে একটি যৌক্তিক মহাবিশ্ব তৈরি করেছিলেন, যা যুক্তি এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হতে পারে। যাই হোক, আমিএই ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করি যে, ধর্ম জাদু থেকে বিবর্তিত হয়েছে, যে কারণে 'জাদু, ধর্ম এবং বিজ্ঞানের' সাধারণ শব্দক্রমটি এড়িয়ে চলেছি। এই ক্রমটি ঊনবিংশ শতাব্দীতে টাইলার, স্পেন্সার এবং ফ্রেজারের মতো নেতৃস্থানীয় সামাজিক বিবর্তনবাদীদের অবদান। তাঁরা মনে করেছিলেন, ধর্ম জাদু থেকে উদ্ভূত। সম্ভবত ব্রিটিশদের সবকিছুর প্রতি তাঁদের বিদ্বেষের কারণে, ডুর্খহাইম এবং তাঁর শিষ্যরা একমত ছিলেন না। ডুর্খহাইমের মতে, জাদু কোনও প্রাথমিক উপাত্ত এবং ধর্ম তা থেকে উদ্ভূত নয়। একেবারে বিপরীতভাবে, জাদুকরদের শিল্প যে নিয়মের উপর নির্ভর করে, তা ধর্মীয় ধারণার প্রভাবে গঠিত হয়েছিল। হুবার্ট এবং মাউস জাদুকর দ্বারা ব্যবহৃত আপাতদৃষ্টিতে ধর্মনিরপেক্ষ প্রক্রিয়াগুলির পিছনে থাকা ধর্মীয় ধারণাগুলির একটি সম্পূর্ণ পটভূমি প্রকাশ করে বলেছেন, আমরা এখন বুঝতে পারি, কেন জাদু ধর্মীয় উপাদানগুলিতে এত পূর্ণ, কারণ ধর্ম থেকে জাদুর জন্ম হয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় উভয় দৃষ্টিভঙ্গিই বিশ্বাসযোগ্য নয়। নৃতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক নথি উভয়ই ইঙ্গিত করে যে, ধর্ম এবং জাদু একসঙ্গে বিকশিত হয়েছিল এবং সর্বদা আলাদাভাবে স্বীকৃত ছিল। এমনকি আদিম মানুষও বৃষ্টির দেবতার কাছে বলি দেওয়া এবং মন্ত্র পড়ার মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ছিল। ঠিক যেমন আধুনিক যুগে ক্রীড়াবিদরা খেলার আগে প্রার্থনা করা এবং তাদের লাকি জার্সি পরার মধ্যে পার্থক্য জানে। ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে জাদুর চলার বড় উদাহরণ আমাদের অথর্ব বেদ। যোগীরাজ বসু তাঁর 'বেদের পরিচয়'-এ লিখেছেন, বেদের অথর্বন নামে পুরোহিতকে ইন্দ্রজাল পারদর্শী বলে মনে করা হত। রিষ্টি (অশুভ, অকল্যাণ) শান্তি, ব্যাধি নিরাময়, অনাবৃষ্টি নিবারণ, পুত্রেষ্ঠি প্রভৃতি মাঙ্গলিক কর্মে তাঁদের কাছে প্রার্থনা করতে। এর ফলে অথর্বন ও জন্দ্ আবস্তা-র 'অথ্রবন্' শব্দ দুটি মঙ্গলপ্রসু, ইন্দ্রজাল বিদ্যাবোধক হয়ে পড়ে। এর বিপরীতে শত্রুবধ, মারণ, উচাটন ইত্যাদি অমঙ্গলপ্রসূ অভিচারাদি ক্রিয়াকলাপকে 'আঙ্গিরস' (ব্ল্যাক ম্যাজিক) বলে অভিহিত করা হত। অথর্ববেদে এই সব নিয়ে বহু মন্ত্রতন্ত্র আছে।

যে ধর্মগুলি স্বর্গে, বেহেস্তে সবচেয়ে মূল্যবান পুরস্কারের কথা বলে, বিনিময়-সম্পর্কে তাদের দেবতাদের সঙ্গে মানুষ জড়িয়ে থাকে বেশি। এর অর্থ, পরকালে প্রচুর পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে, মানুষকে অবশ্যই ইহকালে দেবতা এবং পাদ্রি, মৌলবি, গুরু-পুরোহিতদের প্রতি বাধ্য থাকতে হবে। কেউ এককালীন ভিত্তিতে জাদুকরী ফলাফল পেতে পারে। কিন্তু পরকালের পুরস্কারের জন্য সারা জীবনের উত্তম কর্মফলের প্রয়োজন হয়। প্রকৃতপক্ষে, পার্থিব পুরস্কারই দেবতাদের প্রতি মানুষের আনুগত্যকে অচলা করে তোলে। গুলি সাধারণত নানা নীতি-নৈতিকতা, যেমন পোশাকে শালীনতা, বিবাহের বাইরে সতীত্ব, সংযম, সততা, খাদ্যাভ্যাসের নিয়ম, কথাবার্তার উপর বিধিনিষেধ ইত্যাদির মধ্যে ছড়িয়ে। এইভাবে, ঈশ্বরীয় ধর্মগুলি নৈতিক শৃঙ্খলাকে কার্যকর করতে সক্ষম হয়। এর বিপরীতে, ঈশ্বরহীন ধর্ম এবং জাদুবিদ্যার অতিপ্রাকৃত উপাদানের নৈর্ব্যক্তিকতা মানুষের উদ্দেশ্য এবং নৈতিকতাকে অপ্রাসঙ্গিক করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে, যদি কোনো 'কাজ' করার জন্য, বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত কাউকে প্রয়োজন হয়, তবে কার্যটি অভ্যন্তরীণ অনুভূতি বা নৈতিক গুণের সঙ্গে নয়, কেবলমাত্র তার যান্ত্রিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুতরাং, জাদু নৈতিকতাকে অনুপ্রাণিত করতে পারে না।

বিজ্ঞানও নৈতিকতাকে সমর্থন করতে পারে না। ডোনাল্ড এন লেভিন (সোসাইটি অ্যান্ড নলেজ) মনে করেন, 'সামাজিক তত্ত্ব' এমন প্রশ্নগুলির সমাধান করতে পারে, যা বিজ্ঞান পারে না। অর্থাৎ সামাজিক তত্ত্ব হল অবৈজ্ঞানিক নৈতিকতার একটি রূপ। প্রকৃতপক্ষে, অগাস্ট কোঁত যখন সমাজবিজ্ঞান শব্দটি উদ্ভাবন করেছিলেন, তখন এটি এমন একটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করার জন্য ছিল, যা নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসাবে এবং ধর্মের বৈজ্ঞানিক বিকল্প হিসাবে কাজ করবে। কিন্তু, দীর্ঘকাল ধরে স্বীকৃত, কেউ নিজের সমস্যাকে নৈতিক প্রশ্ন থেকে বৈজ্ঞানিক প্রশ্নে পরিবর্তন করতে পারে। তবে 'নৈতিকতার বিজ্ঞান' বাক্যাংশটি প্রতিটি ধারণার সীমাকে লঙ্ঘন করে। দস্তয়েভস্কির চরিত্র ইভান কারমাজভ সত্যের অনেক কাছাকাছি এসেছিলেন, যখন তিনি বলেছিলেন, 'ঈশ্বর যদি মৃত হন, তবে সবকিছুই অনুমোদিত।' অবশ্য যে কোনও সংখ্যক নৈতিক নিয়ম খাঁটি ধর্মনিরপেক্ষ ভিত্তিতে জোর দিতে পারে। এবং পর্যাপ্ত গোষ্ঠী সংহতি থাকলে সেগুলি প্রয়োগ করাও যেতে পারে। তার পরেও একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক সমস্যা রয়ে যায়। ঐশিক বৈধতা না থাকলে কীভাবে নৈতিক নিয়মগুলিকে ন্যায়সঙ্গত করা সম্ভব, যাতে সেগুলি স্বেচ্ছাচারী, অস্থায়ী এবং ব্যক্তিগত পছন্দের অধীন হয়ে না ওঠে?

বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের মূল পার্থক্য, বিজ্ঞানে চরম সত্য বলে কিছু হয় না। সব আপেক্ষিক। ফলে আজ যা সত্য বলে মনে করা হচ্ছে, কাল যদি তার অন্যথা হয়, বিজ্ঞান দ্রুত তাকে গ্রহণ করে পুরনো মতবাদকে বাতিল করে। বিপরীতে ধর্ম কিছু আপ্তবাক্য নির্ভর। তা অলঙ্ঘ্য, অপরিবর্তনীয়। তার বাইরে তারা বেরোতে পারে না। সেই জন্য বিজ্ঞান গতিশীল ভাবনা, ধর্ম স্থবির। বিজ্ঞানের নিয়মে পর্যবেক্ষণ কেবল পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্ত এবং তা তত্ত্ব নির্মাণে সহায়ক হয়। তবে এটাও ঘটনা, যে কোনও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পর্যবেক্ষণের ফলে বিপরীত ধারণা পোষণ করতে পারে। একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কিছু পর্যবেক্ষণযোগ্য অবস্থার পূর্বাভাস দেয় এবং অন্য কিছু অবস্থান বাতিল করে। বিজ্ঞান বলে, এটিই ঘটতে হবে এবং এটি ঘটতে পারে না। যখন এই ভবিষ্যদ্বাণী এবং নিষেধাজ্ঞাগুলি প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না, তখন সেই তত্ত্বটি প্রত্যাখ্যান বা সংশোধন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তত্ত্বগুলি ভুল প্রমাণ হওয়ার মাধ্যমেই বিজ্ঞানের এগিয়ে চলে। যে তত্ত্বগুলি ব্যর্থ হয় বা যেগুলি কম কার্যকর, সেগুলিকে নির্মমভাবে নির্মূল করে, নতুন গ্রহণ করে।

সংশোধনের প্রতি দুর্বলতা যেমন বিজ্ঞানের প্রাথমিক গুণ, তেমনি এটি জাদুবিদ্যার প্রাথমিক দুর্বলতা। এটি ধরে নেওয়া হয় যে, বৈজ্ঞানিক 'সত্যগুলি' অস্থায়ী, ভবিষ্যতে প্রত্যাখ্যান বা সংশোধনসাপেক্ষ। এই তত্ত্বের উপর জাদু নির্ভর করে না। যখন জাদু ব্যর্থ হয়, যেমনটি প্রায়শই হয়, তা খুব কমই জাদুকরকে সংশোধন করতে অনুপ্রাণিত করে। যেমন, মালিনোস্কি দাবি করেছিলেন, 'বিজ্ঞান যুক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় এবং পর্যবেক্ষণ দ্বারা সংশোধন করা হয়, জাদুতে এর কোনোটাই খাটে না।' এর বিপরীতে, যেহেতু ধর্ম তার প্রধান ব্যাখ্যাগুলিকে এমন একটি পরিধিতে সীমাবদ্ধ রাখতে সক্ষম যা পরীক্ষানিরীক্ষার অধীন নয়, জাদুবিদ্যার বিপরীতে এটি মিথ্যাচার থেকে মুক্ত হতে পারে। অবশ্যই, আমি ধর্মীয় ভবিষ্যদ্বাণী এবং ক্রিয়াকলাপগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সচেতন, যেগুলোতে ভুল হওয়ার ঝুঁকি সবসময়ই থাকে। কিন্তু এগুলি ধর্মীয় সংগঠনগুলির সাফল্যের জন্য অপ্রয়োজনীয় এবং ধর্মগুলি পরিপক্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা এই ধরনের উদ্যোগগুলি বন্ধ করে দেয়, যা ধর্মকে জাদুর বিপরীতে প্রচুর সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা পাইয়ে দেয়। যদিও ধর্ম একজন ব্যক্তিকে এই জীবনে ভোগান্তির ক্ষতিপূরণ হিসাবে স্বর্গে পাঠিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিতে পারে। জাদু এখানে এবং এখন আনন্দ দিতে চায়। ধর্ম যখন নিঃসঙ্গদের আশ্বস্ত করে যে ঈশ্বর তাদের ভালোবাসেন, তখন জাদু তাদের প্রেমিকদের আকর্ষণ করায় অনুপ্রাণিত করে। এই নির্দিষ্ট এবং পার্থিব শর্তগুলি অসমর্থিত হওয়ার জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ; যখন সেগুলি ব্যর্থ হয়, তখন সেই সত্যটি সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই ধর্মের তুলনায় জাদুবিদ্যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পণ্য। অতএব, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জাদু এবং ধর্ম পৃথক হওয়ার প্রবণতা থাকবে, কারণ ধর্মপন্থী বিশেষজ্ঞেরা তাঁদের 'পণ্য লাইন' থেকে জাদুকে নির্মূল করার প্রবণতা দেখাবে, এটি জাদু বিশেষজ্ঞদের উপর ছেড়ে দেবে। এই বিষয়ে একটি ক্লাসিক গবেষণাপত্রে, ডেভিড জি ম্যান্ডেলবম বর্ণনা করেছেন, কীভাবে সমস্ত মহান প্রাচ্যধর্মের পুরোহিতরা স্থানীয় জাদুকরদের সঙ্গে একটি স্বীকৃত সহাবস্থান বজায় রাখেন। লোকেরা তাদের সাধারণ কল্যাণ নিশ্চিত করতে এবং ধর্মের মাধ্যমে পার্থিব পুরস্কার অর্জন করতে চায়, তবে নির্দিষ্ট এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের জন্য জাদুকরদের পরামর্শ নেয়। সুতরাং, তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত 'তাৎক্ষণিক এবং নির্দিষ্ট অসুস্থতা

নিরাময়ের' চেষ্টা করবেন না। এর জন্য, মানুষকে অবশ্যই একজন জাদুকরের পরামর্শ নিতে হবে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের পরীক্ষামূলক ব্যর্থতার ঝুঁকি নেওয়ার দরকার নেই কারণ তাঁদের কাছে ঝুঁকি ছাড়াই দেওয়ার জন্য অনেক বেশি মূল্যবান পণ্য রয়েছে।

পরিশেষে জানাই, উপরে ইন্দ্রজাল বা জাদু এবং জাদুকর সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা হোকাস পোকাস ম্যাজিককে দূরে রেখেছি। তবে এই ম্যাজিক বা জাদুর সঙ্গেও ধর্মের সম্পর্ক নিবিড়। ধর্মগুরুরা অতিপ্রাকৃত শক্তির কথা বলেন। ঐশ্বরিক শক্তির কথা বলেন। যার আদপে কোনো অস্তিত্ব নেই বা যা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তাই সাধারণ মানুষের বিশ্বাস উৎপাদন করতে প্রমাণ হিসাবে তাঁরা ম্যাজিকের আশ্রয় নিতেন এবং নেন। কখনও বা সম্মোহনবিদ্যারও। ইয়া পেরেলম্যান তাঁর 'ফিজিক্স ফর এন্টারটেনমেন্ট'-এ প্রাচীন আলেজান্দ্রিয়ার গণিতবিদ তথা যন্ত্রবিদ হেরনের আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রয়োগ করে মিশরে কীভাবে মন্দিরের সামনের বেদীতে যজ্ঞ করে তার সাহায্যে মন্দিরের দরজা খোলা হত তার কৌশল জানিয়েছেন। দেখিয়েছেন কিছু মন্দিরে কীভাবে যজ্ঞাগ্নিকে অনির্বাণ রাখা হত। আমাদের সাঁইবাবা হাতসাফাই করে শূন্য থেকে ঘড়ি, মিষ্টি ইত্যাদি এনে ভক্তদের দিতেন। পি সি সরকার জুনিয়র ভক্ত সেজে সেই কৌশল ধরে ফেলেন, তা নিয়ে সেই সময় ব্যাপক হৈ চৈ হয়। এর বিপরীতে বহু জাদুকর বিজ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োগ করে এমন সব ইলিউশনের খেলা দেখান, তা দেখে, তার রহস্য বুঝতে না পেরে, অনেক সময়েই দর্শকেরা জাদুকরদের ঐশ্বরিক ক্ষমতাধর বলে মনে করতেন। যেমন, জাদুকর গণপতির ইলিউশন বক্সের খেলা দেখে সাধারণ দর্শক বিশ্বাস করত, অলৌকিক ক্ষমতা ছাড়া এই খেলা দেখানো সম্ভব নয়। বিশ্বখ্যাত হ্যারি হুডিনির এসকেপ বা পলায়নের খেলা দেখে শার্লক হোমস-স্রষ্টা আর্থার কোনান ডয়েলেরও দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল, এটা অলৌকিক ক্ষমতা ছাড়া করা সম্ভব নয়। এই সব ঘটনা থেকে বোঝা যায়, নানা কৌশলে দু ধরনের জাদুই ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের অপরিহার্য অঙ্গ।

উমা

নদী-সংযোগ প্রকল্প

খোদার ওপর খোদকারি?

শুভমিতা চৌধুরী ও সুদেষ্ণা ঘোষ

২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে, প্রধানমন্ত্রী কেন-বেতোয়া নদীর সংযোগ প্রকল্পের কাজের উদ্বোধন করতে গিয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে দেশব্যাপী এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে বিরোধিতার যে ঢেউ উঠেছে, তাতে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না। আমরা অবাক হচ্ছি না, কারণ বিগত দুই দশক জুড়ে এই পরিকল্পনার সমস্যাগুলিকে তুলে ধরে বহু সমালোচনা, এমনকি মামলা হওয়া সত্ত্বেও যখন কেন-বেতোয়া নদীর লিংকের কাজ শুরু হল, তখন এটা স্পষ্ট যে, এই বিধ্বংসী প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করতে সরকার বদ্ধপরিকর।

আমাদের দেশে নদী-সংযোগের চিন্তাভাবনা নতুন নয়। স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালে কে এল রাও এবং ১৯৭৭ সালে ক্যাপ্টেন দস্তুর 'ইন্টার-বেসিন ওয়াটার ট্রান্সফার'-এর প্রস্তাব দিয়েছিলেন। জলসম্পদ মন্ত্রণালয় (Ministry of Water Resources) এবং কেন্দ্রীয় জল কমিশন (Central Water Commission:CWC) আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস এবং জল সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে আন্ত-অববাহিকা জল স্থানান্তরের জন্য ১৯৮০ সালে জল সম্পদ উন্নয়নের জন্য একটি National Perspective Plan (NPP) উপস্থাপন করে। ২০০২ সালে গৃহীত নতুন জলনীতিতে 'উদ্বৃত্ত' অঞ্চল থেকে 'ঘাটতি' অঞ্চলে জল সরবরাহের লক্ষ্যে দেশকে কয়েকটি জল-অঞ্চলে বিভক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। ২০০২ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি বন্যা ও খরার সমস্যা মোকাবিলায় নদীগুলির আন্তঃসংযোগ স্থাপনের প্রস্তাবকে আহ্বান জানান। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ৩১ অক্টোবর, ২০০২-এ এক যুগান্তকারী রায় দেন, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারকে এক দশকের মধ্যে নদীর 'নেটওয়ার্কিং'-এর কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

বহু নামি সংস্থা এবং পরিবেশ সচেতন মানুষ এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছিলেন। আমরা দুজন ভূগোলের শিক্ষিকাও তাঁদের মধ্যে ছিলাম। ২০০৪ সালে রাষ্ট্রপতি ড. এ পি জে আব্দুল কালামকে একটি চিঠি লিখে আমরা এই প্রকল্পের কার্যকারিতা সম্পর্কে আমাদের আশঙ্কা এবং তার কারণগুলি বিস্তারিতভাবে জানিয়েছিলাম। সে চিঠির কোনও উত্তর আমরা পাই নি। সে সময় আমরা টাস্ক ফোর্স অন ইন্টারলিংকিং অফ রিভারস্-এর চেয়ারম্যানকেও চিঠি লিখে আমাদের আপত্তির কথা জানিয়েছিলাম। বলা বাহুল্য সেই চিঠিরও কোনও সদুত্তর পাওয়া যায় নি। ড. কালাম তাঁর *Ignited Minds* বইয়ে India Vision 2020-তে নদীগুলিকে সংযুক্ত করার মহান কর্মযজ্ঞে তরুণদের

সক্রিয় ভূমিকা নিতে আহ্বান জানিয়েছেন (Ignited Minds পৃ.৩০)। ড. কালাম-এর মতো একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ নদীগুলিকে সংযুক্ত করার প্রকল্পকে সায় দিয়েছেন দেখে আমরা খুবই হতাশ হয়েছিলাম। প্রায় ২১ বছর বাদে প্রধানমন্ত্রী মোদী যখন কেন-বেতোয়া নদীর সংযোগ প্রকল্পের কাজের উদ্বোধন করলেন, তখন সেই হতাশা উদ্বেগে পরিণত হল। এই লেখার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ নয়, পাঠকের সামনে কেন-বেতোয়া প্রকল্পের ভালো-মন্দ আমরা তুলে ধরতে চাই। পাঠক বিচার করে মতামত দেবেন।

আন্তঃ-অববাহিকা জল স্থানান্তর প্রকল্পের অন্তর্গত ৩০টি লিংকের মধ্যে কেন-বেতোয়া নদীর সংযোগটি ভারতবর্ষে নদী সংযোগ প্রকল্পকে কার্যকরী করার প্রয়াসের প্রথম পদক্ষেপ। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই প্রকল্পের ইতিবাচক দিকগুলো দেখা যাক। ন্যাশনাল ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি-র মতে এটি মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশের ৬২ লক্ষ মানুষের জীবন বদলে দেবে। ৪৪৬০৫ কোটি টাকার এই প্রকল্প বুন্দেলখণ্ডের কৃষিতে বিপ্লব আনবে। ১০ লক্ষ হেক্টর জমিতে চাষ হবে, ১০৩ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ এবং ২৭ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করবে। পানীয় জলের ব্যবস্থাও আরো উন্নত করা হবে। ৫০০০ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এই প্রকল্পটি বুন্দেলখণ্ডের অর্থনীতিতে স্বর্ণযুগের সূচনা করবে। কিন্তু আমরা যদি আরও গভীরভাবে চিন্তা করি, তাহলে আমরা এই প্রকল্পের নেতিবাটক দিকগুলি বুঝতে সক্ষম হব।

২১ ডিসেম্বর ২০২৪, The Wire পত্রিকাটি কেন-বেতোয়া নদীর সংযোগ প্রকল্প সম্বন্ধে বলেছিল, 'এই প্রকল্পটি জল ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে ত্রুটিপূর্ণ নীতির একটি উদাহরণ, যা নতুন গবেষণা, বিশেষজ্ঞ পর্যালোচনা এবং যথাযথ মূল্যায়ন প্রত্যাখ্যানের দ্বারা চিহ্নিত। দুঃখের বিষয় হল, এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে National Green Tribunal (NGT)-এ, এমনকি সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা সত্ত্বেও কোনও পুনর্মূল্যায়ন বা পরিবর্তন করা হয় নি।'

প্রকল্পটি 'জলের উদ্বৃত্ত' এবং 'জলের ঘাটতি' ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি। অথচ এই ধারণাটির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কোনও স্বাধীন সংস্থা দ্বারা যাচাই করাই হয় নি। যে জল সরবরাহ এবং চাহিদার তথ্যের উপর নির্ভর করে এই ধারণাকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে, তা-ও ২০০৩-'০৪ সালের (The Wire,২০২৪)! ভূগর্ভস্থ জলের মাত্রাতিরিক্ত উত্তোলন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের যুগে, জলের সরবরাহ এবং চাহিদা যেখানে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল, সেখানে এত গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত কিভাবে প্রায় দু-দশক পুরনো তথ্যের ভিত্তিতে নেওয়া হল তা ভাবলে অবাক লাগে। এই উপমহাদেশে বৃষ্টিপাত এবং পলি জমার ধরণ ও পরিমাণ ক্রমাগত পরিবর্তন হয়ে চলেছে। কাজেই নদী-সংযোগ ব্যবস্থা কিছু বছর যদিও বা জল সরবরাহ করতে সাহায্য করে, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে ক্ষতিই বেশি হবে। নদী-সংযোগ প্রকল্পের বদলে সমন্বিত জলসম্পদ ব্যবস্থাপনার (ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট) দ্বারা বেতোয়া অববাহিকাকে আরও সমৃদ্ধ করা যেতে পারে। সরকারের মূল দাবি হল—কেন এবং বেতোয়া অববাহিকা যথাক্রমে 'জল-উদ্বৃত্ত' এবং 'জল-ঘাটতিপূর্ণ'। এই ধারণাটি বিভ্রান্তিকর। বেতোয়া অববাহিকা তথাকথিত 'জল-ঘাটতিপূর্ণ' হবার একটি কারণ হল যে, এখানে কয়েক লক্ষ হেক্টর ফসলি জমিতে সেচের জন্য জল সরবরাহ করা হয়। যদি কেন অববাহিকায় সেচের জন্য জলের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তাহলে এই অববাহিকাটিও যে 'জল-ঘাটতিপূর্ণ' হিসেবে গণ্য হবে না, তারই বা স্থিরতা কি? (The Hindu, ২০২৪)। Expert Appraisal Committee (EAC) নির্দেশ দিয়েছিল যে তিন বছরের জলপ্রবাহ তথ্য পর্যবেক্ষণ করার পর বর্ষাকাল ছাড়া অন্যান্য মাসে নদীতে পরিবেশগত প্রবাহ (অথবা ই-ফ্লো) নিশ্চিত করতে। কিন্তু EAC-র এই মূল শর্তটি মানা হয় নি। উল্লেখযোগ্যভাবে, কেন নদীর প্রবাহ বছরের বেশিরভাগ সময়েই নগণ্য, যদিও পূর্ববর্তী পরিকল্পনা কমিশনের অন্তর্ভুক্ত 'চতুর্বেদী প্রতিবেদন' সমস্ত নদী-প্রকল্পের জন্য ন্যূনতম ৩০ শতাংশ ই-ফ্লো বজায় রাখার সুপারিশ করেছিল। কেন-বেতোয়া লিংকের কারণে কেন নদীর জলের পরিমাণ আগামী দিনে আরও কমে যাবে এবং নদীর তলদেশে প্রায় ১০.৩ মিলিয়ন ঘনমিটার পলি জমা হয়ে নদীর জলপ্রবাহ ও বাস্তুতন্ত্রের উপর প্রভাব ফেলবে। (The Wire,২০২৪)

২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নিযুক্ত Central Empowered Committee (CEC)-র বিস্তারিত প্রতিবেদনটি সুপ্রিম কোর্ট বিবেচনা করে নি। CEC রিপোর্টে বলা হয়েছে যে কেন-বেতোয়া লিংকের বাস্তবায়ন ব্যাপক পরিবেশগত ধ্বংসের কারণ হবে এবং তার সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবগুলির সাশ্রয়কর বিকল্প অনুসন্ধান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের কারণে, পান্না ন্যাশনাল পার্কের ২৮% অংশ জলে ডুবে যাবে। প্রকল্প চলাকালীন ৬,০০০-এর বেশি শ্রমিক পরিবারকে দীর্ঘ সময় ধরে এই জাতীয় উদ্যানের ভিতরে বসবাস করতে হবে। Detailed Project Report (DPR) অনুমান করে যে ৩২,৯০০টি গাছ কেটে ফেলা হবে,

যা প্রতি হেক্টরে সাতটি গাছের সমান, (CEC-র অনুমান অনুযায়ী ২০২১ সালে ৪৩ লক্ষ গাছ হারিয়ে যাবে, এবং এই সংখ্যা এখন আরও বাড়বে) যা পান্না ন্যাশনাল পার্ককে মরুভূমিতে পরিণত হবার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে (The Wire,২০২৪)।

কেনের উপর দাউধান বাঁধ, পান্না টাইগার রিজার্ভের মধ্যে তৈরি করা হবে। এটি কেবল বাঘ সংরক্ষণকেই প্রভাবিত করবে না, কেনের ঘড়িয়াল অভয়ারণ্যকেও মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করবে, যা অত্যন্ত বিপন্ন গাঙ্গেয় ঘড়িয়ালের (*Gavialis gangeticus*) আবাসস্থল। আশ্চর্যজনকভাবে, বাঁধটি যে পান্না ন্যাশনাল পার্কের মূল এলাকার অন্তর্ভুক্ত, এ কথা Environmental Impact Assessment (EIA)-এর প্রতিবেদনে উল্লেখই করা হয় নি (The Wire,২০২৪; https://iasbaba.com/2023/01/ken-betwa-river-link-project/)।

এখন পর্যন্ত যা আলোচিত হল, তা যদি কেন-বেতোয়া নদী-সংযোগ প্রকল্পকে বন্ধ করার জন্য যথেষ্ট না হয়, তবে এর ওপর আরও একটি ভূতাত্ত্বিক কারণও উল্লেখ করা প্রয়োজন। পোখরা বেসমেন্ট চ্যুতিটি (Pokhra Basement Fault) পান্না এবং কেন নদীর গতিপথের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। সাম্প্রতিক একটি গবেষণাপত্রের লেখকরা (Godin et al.,২০২৩), লিখছেন যে 'পান্না অববাহিকা অঞ্চলের শিলাগুলির একটি জটিল ও দীর্ঘ ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস রয়েছে, যার মধ্যে পোখরা চ্যুতির সাথে সংশ্লিষ্ট চ্যুতিগুলির সাম্প্রতিক ভূ-আলোড়নের (neotectonics) কারণে পুনঃসক্রিয়করণ (reactivation) ঘটেছে। এই সাম্প্রতিক ভূ-আলোড়নের জন্য এখানকার একাধিক নদীখাতও পরিবর্তিত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে এটা আশঙ্কা করা ভুল নয় যে, সক্রিয় টেকটোনিক্সের কারণে এই এলাকার ভিত্তি-স্তর (basement rock) এমনভাবে প্রভাবিত হবে যে বাঁধজাতীয় যে কোনেও কাঠামোকে ব্যাপকভাবে ক্ষতি করতে পারে (The Wire,২০২৪)।

প্রতিটি নদী অববাহিকা একটি স্বতন্ত্র ভূ-প্রাকৃতিক একক, যার মধ্যে তার একটি নিজস্ব জলচক্র প্রকৃতির নিয়মে চলে। সেই প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ করলে তার পরিবেশগত মূল্য আমাদের অবশ্যই চোকাতে হবে। তাছাড়াও, বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক খরচকেও মাথায় রাখতে হবে, যেমন—বাস্তুচ্যুত মানুষদের পুনর্বাসনের খরচ, (যদি তারা আদৌ পুনর্বাসিত হন), বুন্দেলখণ্ডের অসম ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে ব্যয়বহুল লিফট সেচ, লিফট সেচের জন্য ব্যবহৃত বিদ্যুৎ, যার জন্য কোনও রাজস্ব দাবি করা যাবে না, একটি রোপওয়ে স্থাপনের খরচ, অতিরিক্ত পাম্পিং স্টেশন, জলাধার নির্মাণ এবং ক্ষুদ্র সেচের জন্য ট্রান্সমিশন লাইনে খরচ, বাম তীরের খালের দৈর্ঘ্য ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করার খরচ এবং আরও অনেক কিছু। এই সমস্ত পরিকাঠামোগত পরিবর্তনগুলির জন্য খরচ; লাভ অনুপাতের (cost:benefit ratio) পুনর্গণনা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত (The Wire,২০২৪)।

এই আলোচনাটিকে একটি দীর্ঘ, অন্তহীন বিতর্কের দিকে ঠেলে না দিয়ে, এটাই বলা যায় যে, প্রকৃতির চিরাচরিত ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে না গিয়েও অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলে ফসল ফলানো যেতে পারে যদি সেচ-নিবিড় ফসল চাষের পরিবর্তে আমরা পরম্পরাগত জ্ঞানের (traditional knowledge) দিকে ফিরে যেতে পারি এবং সেই এলাকার জলবায়ু এবং মাটির সাথে মানানসই ফসল চাষ করতে পারি। সব অঞ্চলে একই পরিমাণ সেচ-প্রধান ফসল উৎপাদনের জন্য সমান পরিমাণে জল এবং একই রকম মাটির অবস্থা থাকতে পারে না। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে এবং বুঝতে হবে যে প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতে অভিন্নতা আনা উন্নয়ন নিশ্চিত করে না। যদি আমরা কৃষি উন্নয়নের জন্য তথাকথিত 'উদ্বৃত্ত' নদী থেকে 'ঘাটতি' নদীতে জল পুনর্বণ্টনের এই যুক্তি অনুসরণ করতে চাই, তাহলে আমরা একই যুক্তিতে এও বলতে পারি যে সম্পদ 'সমৃদ্ধ' থেকে 'দরিদ্র' জনগোষ্ঠীতে পুনর্বণ্টন করলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে! এই ক্ষেত্রে সমাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের মতামত কী?

তথ্যসূত্র:

•Godin, L., Crilly, B., Schoenbohm, L.M. and Wolpert, J. (2023) Recent basement fault reactivation and fluvial drainage modification in an intraplate setting, eastern Bundelkhand Craton, Madhya Pradesh, India. Geomorphology, Volume 436. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2023.108781. •https://cms.thewire.in/environment/ken-betwa-interlink-means-bundelkhand-will-suffer-for-decades-to-come •https://iasbaba.com/2023/01/ken-betwa-river-link-project/ •https://thewire.in/environment/ken-betwa-river-linking-project-a-recipe-for-bulldozing-public-policy-amidst-environmental-concerns •https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169555X23002015?via%3Dihub • https://www.thehindu.com/opinion/editorial/pushed-through-on-the-ken-betwa-river-interlinking-project/article69029968.ece

উমা

পরিযায়ী পাখিদের চলাচল — কারণ অনুসন্ধান

প্রদীপ্ত গুপ্তরায়

কিছু কিছু পাখিদের বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে যায়। আবার কিছু দিন পরে সেই পাখির দল আবার ফিরে যায় নিজের জায়গায়। পরিযায়ী পাখিদের এই যে নির্দিষ্ট স্থান থেকে যাত্রা শুরু করে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় যাওয়া এবং সেখান থেকে আবার তাদের বাসস্থানে ফিরে যাওয়া —এটা বিস্ময়কর একটা ঘটনা। প্রাচীন যুগ থেকে এখন অব্দি পাখিদের এই যে চলাচল, যেটা সাত দিনরাত্রি ধরে টানা উড়ান হতে পারে (প্রশান্ত মহাসাগর থেকে নিউজিল্যান্ড —প্রায় ১২০০০ কিলোমিটার) বা খুব কম দৈর্ঘ্যের উড়ান হতে পারে। অ্যারিস্টটলের মতো দার্শনিক ভেবেছিলেন, এই ধরনের পাখিরা শীতঘুমে চলে যায়। বর্তমানে পাখিদের গলায় পট্টি এবং উপগ্রহ মাধ্যমের তথ্য দিয়ে আমরা পরিযায়ী পথ চিনতে পারি। আশ্চর্যজনক ঘটনা যেটা তা হল—পরিযায়ী পাখিদের যাত্রাপথের খুঁটিনাটি ভীষণভাবে নিখুঁত, অর্থাৎ কোন অক্ষাংশ এবং কোন দ্রাঘিমাংশ ধরে পাখীরা চলাচল করবে সেটা সুনির্দিষ্ট। কিছু পরিযায়ী পাখির বাচ্চার ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, তাদের প্রথম উড়ানেই পূর্ববর্তীরা যে পথে গেছে সেই পথই তারা অনুসরণ করে এবং সেক্ষেত্রে তারা তাদের বড়দের সাহায্য নেয় না। এই যাত্রাপথকে 'পরিযায়ী পথ' (migratory flyways) বলা হয়। একেকটা দল বছরের প্রায় ছয় সাত মাস ধরে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে উড়ে চলে। উদাহরণ হিসাবে 'আর্কটিক টার্ন' নামের এক পাখির নাম করা যেতে পারে। এই পাখিটি উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুতে যাওয়া এবং ফিরে আসায় বছরে প্রায় ৬০,০০০ মাইল ভ্রমণ করে। কিছু পাখি দূরপথযাত্রী আবার কিছু নিকটযাত্রী। দেখা গেছে পৃথিবীর বিভিন্ন পাখিদের মধ্যে ২০% পরিযায়ী পাখি।

কেন এই পাখিদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ভ্রমণ? আমরা কিছু কারণ সাধারণভাবে জানি; যেমন, ১) খাবারের পরিমাণ কম হলে, ২) বিশ্রাম এবং থাকার জায়গার অপ্রতুলতা হলে, ৩) তাদের বংশবৃদ্ধি করার কারণে, ৪)যে জায়গায় বসবাস করে সেখানকার উষ্ণতার পরিবর্তন যদি অনেকটাই হয়। ঠাণ্ডা পরিযায়ীর এক অন্যতম কারণ হলেও, যদি পর্যাপ্ত খাবার পেওয়া যায়, হামিং বার্ড বা হাঙ্কোর মতো কিছু পাখি কিন্তু স্থানান্তরিত হয় না। কিছু পরিযায়ী পাখি, যে জায়গায় সাধারণভাবে বসবাস করে, সেখানে শীতের দিনে সূর্যের আলো এবং উষ্ণতা কমে যাবার কারণে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়—যেখানে বেশি সূর্যালোক এবং উষ্ণতা আছে সেখানে যেতে পছন্দ করে। কিছু পরিযায়ী পাখি দিনের আলোতে যাতায়াত করে। কিছু কিছু পাখি, যেমন—চড়াই বা কোকিল, কোনও তারাকে দিগ্‌নির্দেশিকা ধরে রাত্রে নিজেদের চালনা করে। অন্তর্জাল খুঁজলে পরিযায়ী পাখির একটি তালিকা পাওয়া যায়। তাতে বিভিন্ন পাখির নাম আছে। আর পক্ষীবিশারদরা আছেন। তাঁরা পাখি দেখে কি ধরনের পাখি তা সনাক্ত করেন, করবেন। এই পরিযানের পেছনে সম্ভাব্য কি কি বৈজ্ঞানিক কারণ থাকতে পারে সেটাই খোঁজার চেষ্টায় এই লেখা। অনেকরকম গবেষণা চলছে পরিযায়ী পাখিদের এই নিখুঁত দিগ্‌নির্দেশ বোঝার জন্য। কিন্তু যাতায়াতের রহস্য এখনো পর্যন্ত প্রায় অধরাই আছে। কিছু কারণ বৈজ্ঞানিকরা বের করেছেন। সেই কারণগুলো বলার চেষ্টা করব।

বেশিরভাগ প্রাণীই (যেমন কচ্ছপ, হাঙর ইত্যাদি) ভূচৌম্বকত্বকে বেশি দূরত্বে যাবার জন্য নির্দেশিকা হিসাবে ব্যবহার করে। পাখিরাও পরিযানের ক্ষেত্রে ভূচৌম্বকত্ব ব্যবহার করে কিছুটা জটিল পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতিকে পাখিদের চৌম্বকগ্রহণ ক্ষমতা (avian magnetoreception) বলা হয়। পাখিদের ভেতরে স্বাভাবিক 'কম্পাস' আছে, এইরকমই ভাবা হয়।

পাখিদের ভেতরে একটা স্বাভাবিক ঘড়ির বার্ষিক ছন্দ আছে যেখানে অন্যান্য সব বিষয়ের সাথে কখন তারা উড়বে সেটাও ঠিক হয়। একটা বাচ্চা পাখি কিভাবে তাদের পূর্বপুরুষদের চেনা পথে যায় সেটা বিজ্ঞানীদের কাছে এখনো বিস্ময়। তাঁরা এক অদ্ভুত প্রস্তাব দিয়েছেন : প্রত্যেকটা পাখির মধ্যে একটা নয় তিনটে কম্পাস আছে। একটি আকাশে

সূর্যের অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে তথ্য বিশ্লেষণ করে; অন্যটি রাতে তারাদের অবস্থানের ওপর নিজেদের দিগ্‌নির্দেশ করে; তৃতীয়টি পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রে কাজ করে।

বিজ্ঞানীরা একটা পরীক্ষা করেছিলেন। তাঁরা একটা বিরাট কাঠের বাক্সে এক পরিযায়ী পাখিকে রেখে কিছু তথ্য পাবার চেষ্টা করছিলেন। পরিযানের সময় তাঁরা দেখলেন, পাখিটির এক ধরনের 'পরিযায়ী উদ্বেগ (migration anxiety)' তৈরি হচ্ছে যাতে সে সহজাতভাবে ওড়ার চেষ্টা করছে। তাঁরা কৃত্রিমভাবে চৌম্বকক্ষেত্র পরিবর্তন করে কয়েকটা বিষয় দেখেছিলেন।

১) আলো সক্রিয়করণ (Light activation) : একটা নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের ওপর আলো পড়লে তাদের ভূচৌম্বকত্বের অনুভূতি বৃদ্ধি পায়। দেখা গেছে অতিবেগুনি থেকে সবুজ আলো অব্দি তাদের স্বাভাবিক কম্পাস সক্রিয় থাকে। আবার হলুদ থেকে লাল আলোতে এই চুম্বক উল্টো দিকে ঘুরে যায়।

২) নতি নির্দেশক কম্পাস (Inclination only compass) : পরিযায়ী পাখিরা চুম্বক মেরুর ওপর সংবেদনশীল নয়। চুম্বক মেরু যদি পাল্টে দেওয়া হয়, অর্থাৎ উত্তর মেরুকে দক্ষিণ মেরু করা হয় হয় তাহলে পাখিরা তেমন টের পায় না। কিন্তু তারা চৌম্বক ক্ষেত্র পরিবর্তনের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়াশীল। এর জন্যই আমরা একমাত্র কম্পাসের নতি শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছি।

৩) কার্যকরী ক্ষেত্র (Functional window) : দেখা গেছে স্থানীয় ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের একটা ক্ষুদ্র অংশ তারা উড়ানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। কিন্তু দু-তিন ঘণ্টা উড়ানের পরে তারা পরিবর্তিত চৌম্বক ক্ষেত্র ব্যবহার করতে পারে।

৪) রেডিও তরঙ্গের ব্যাঘাত (RF disruption) : কিছু নির্দিষ্ট রেডিও তরঙ্গের কম্পাঙ্কের কারণে পাখিদের চুম্বক সংবেদনশীলতা নষ্ট হয়ে যায়। মেগাহার্ৎজ পরিসরের রেডিও কম্পাঙ্ক স্বাভাবিক কম্পাসের কাজকে ব্যাহত করে। বিশেষ করে ভীষণ কম শক্তির ১.৩১৫ মেগাহার্ৎজ রেডিও তরঙ্গ কোনও পাখির অবস্থানের বিচ্যুতি ঘটাতে পারে।

পাখিদের ভেতরের কম্পাসের ভূ-চৌম্বক গ্রহণ ক্ষমতা (magnetoreception) : এটা এক জটিল কোয়ান্টাম ঘটনা। এই ঘটনাটি পাখিদের চোখের অণুদের খণ্ডের মধ্যে আলো রাসায়নিক ক্রিয়ায় তৈরি হয়। এই অণু খণ্ডগুলিকে 'র‍্যাডিকাল পেয়ার' বলা হয়। এই র‍্যাডিকাল পেয়ার খুব কম সময়ের জন্য তৈরি হয়। যার ফলে পাখিরা যেন ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের রেখাগুলো 'দেখতে' পায়। সেই পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পাখিরা কোনদিক যাবে সেটা নির্ণয় করে।

এই র‍্যাডিকাল পেয়ারের বৈশিষ্ট্য কি? কেনই বা র‍্যাডিকাল পেয়ার গুরুত্বপূর্ণ? গত ৪০ বছরে গবেষণাগারে অনেক গবেষণা হয়েছে। কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যায় স্পিন কোয়ান্টাম নম্বর বা সংক্ষেপে স্পিন বা ঘূর্ণন নামের একটা রাশি আছে। স্পিন একটা ভেক্টর রাশি অর্থাৎ এর মান এবং দিক দুটোই আছে। এই রাশিকে আমরা ↑ বা ↑ দিয়ে বুঝতে পারি। অর্থাৎ ঘূর্ণন কেবল দুরকমেরই হতে পারে : উঁচু (up) বা নীচু (down)। যেসব কণার ঘূর্ণন চৌম্বক ভ্রামক (spin magnetic moments) আছে তারা আণুবীক্ষণিক চুম্বকের মতো আচরণ করে। অনেক অণুতেই ইলেকট্রনগুলো জোড়ে অবস্থান করে (↑↓) যাতে ঘূর্ণন শূন্য হয়। র‍্যাডিকাল অণুগুলোর একটা ইলেকট্রন নেয় বা ছেড়ে দেয় যাতে তাদের বিজোড় সংখ্যায় ইলেকট্রন অবস্থান করে এবং র‍্যাডিকাল অণুগুলোর ঘূর্ণন চৌম্বক ভ্রামক থাকে। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে যখন দুটো র‍্যাডিকাল একসাথে তৈরি হয় (যে কারণে এদের র‍্যাডিকাল পেয়ার বলা হয়), দুটো জোড়হীন ইলেকট্রন, হয় অসমান্তরাল অবস্থান করে (⇅) বা সমান্তরাল অবস্থান করে (↑↑)। ইলেকট্রনের এই ধরনের অবস্থানকে যথাক্রমে সিঙ্গলেট বা ট্রিপলেট অবস্থা বলে।

যে মুহূর্তে একটা সিঙ্গলেট অবস্থা তৈরি হয় আভ্যন্তরীণ চৌম্বকক্ষেত্রের জন্য সেটি কয়েক মাইক্রোসেকেন্ডে ট্রিপলেট অবস্থায় পরিবর্তিত হয়, আবার পর মুহূর্তে সিঙ্গলেট অবস্থায় চলে যায়, একটা নাচ যেন প্রতিমুহূর্তে চলতে থাকে। ঠিকঠাক শর্তাবলী প্রযোজ্য হলে বাইরের চৌম্বকক্ষেত্রের সিঙ্গলেট-ট্রিপলেট-সিঙ্গলেট পরিবর্তন হতেই থাকে। খুব দুর্বল ভূচৌম্বকক্ষেত্রেও র‍্যাডিকাল পেয়ারের এক সূক্ষ্ম কোয়ান্টাম বল তৈরি হয় যা পাখিদের স্বাভাবিক কম্পাসকে নির্দিষ্ট দিকে চালনা করে।

পরিযায়ী পাখিদের চলন এখনো রহস্যাবৃত। বিভিন্ন ধরনের কাজ চলছে—হাতেকলমে এবং তাত্ত্বিকভাবে। কিভাবে তারা এত নিখুঁতভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলাচল করে সেটা খুঁজে বার করার চেষ্টা চলছে।

তথ্যসূত্র:

১। অন্তর্জালের বিভিন্ন তথ্য

২। V.S.Poonia, Science Reports, p. 48-49, June 2023

৩। P.J. Hore, H.Mouritsen, Scientific American, Vol.326, p.26 (April 2022)

উমা

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি

অঞ্জনকুমার সেনশর্মা

সিন্ধু উপত্যকা এবং বিস্তীর্ণ ভারতীয় উপমহাদেশ এক বিশাল জ্ঞানের ভাণ্ডার সঞ্চিত হয়েছিল যা পশ্চিমদেশগুলো ক্রমে জানতে পারল আরবী ও পার্সি অনুবাদ থেকে। দার্শনিকদের মন্তব্য, গণিতজ্ঞদের গণনা জ্যোতির্বিদদের তৈরি নক্সা, চিকিৎসকদের বর্ণনা, এই সব রচনা দিয়ে ক্রমে গড়ে উঠল বিজ্ঞানের সৌধ।

বিখ্যাত ভারতীয় সাহিত্য যথা 'মহাভারত' 'বেদ'-এর কিছু অংশ, 'যোগ বশিষ্ঠ', ভাগবতগীতা ও ভাগবত পুরাণে। যে দৃষ্টিকোণ এই সব লেখায় রয়েছে তা প্রাকৃতিক দর্শনের মূল : একটি মহাবিশ্ব যা সর্বদাই বদলাচ্ছে, যেখানে সব মৌলিক পদার্থের একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে, সবারই ভাগ রয়েছে একটা সর্বাত্মক ঐক্যে এবং গঠন প্রক্রিয়ার পর্যায়ে। উদাহরণ যোগ বশিষ্ঠ যা প্রায় ৩০ হাজার দীর্ঘ কাব্যের আকারে গল্প এবং নীতিশিক্ষামূলক উপকথা— তার বাস্তবতা, বিভিন্ন নৈতিক ও উল্লেখযোগ্য উপদেশ।

গণিত

দর্শন ও উপকথা ছাড়িয়ে বৈদিক সাহিত্যের চেষ্টা ছিল মহাবিশ্ব ও তার কার্যপ্রণালী, সৃষ্টির চক্র ও গ্রহের গতি অনুধাবন করা, এ দিয়ে সেই সব প্রশ্ন সংগঠিত করা যা সেই থেকে মানুষের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মূল হয়ে রয়েছে। আধুনিক গণিত আমরা যে ভাবে জানি, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর ভারতীয় দার্শনিক ভাস্করের মন্তব্য ছাড়া অকল্পনীয় ছিল। সবচেয়ে প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্যভট্টর সংস্কৃতে লিখিত আর্যভাটিয়ায় গ্রহের ঘুর্ণন বর্ণনা করা হয়েছে। তিনিই প্রথম বলেন যে পৃথিবী বর্তুলাকার, সমতল নয়। এর ওপরে ভাস্করের মন্তব্য প্রথম বহুল প্রচলিত রচনা যাতে শূন্যর ধারণা ব্যবহার করা হয়েছে আর তাকে একটা চিহ্ন দেয়া হয়েছিল, একটা বৃত্ত।

এই মৌলিক ধারণা যে মহাশূন্য, শূন্যতা বা অনুপস্থিতি মহাবিশ্বের অপরিহার্য অঙ্গ তা প্রাক বৈদিক যুগের সংস্কৃতিতে বহু প্রাচীনকাল থেকে বিদ্যমান ছিল। একটা গাণিতিক পদ্ধতি যার উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বের গতি ও ভবিষ্যৎ বর্ণনা করা তাতে স্বাভাবিকভাবেই এটা একটা গাণিতিক চিহ্ন হয়ে যায়। 'শূন্য' তাই যুগপৎ একটি ধারণা এবং একটি প্রকৃত সংখ্যা। গণিতের দিক থেকে শূন্য চিহ্নটা যতটা একটা সংখ্যা ততটাই একটা স্থান ধরে রাখার উপায়।

সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন ভাস্করের সমসাময়িক ব্রহ্মগুপ্ত, প্রাক বৈদিক যুগের একজন গাণিতিক (ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী) যিনি দশমিক প্রণালীটা উন্নত করতে সাহায্য করেছিলেন, দশ সংখ্যার দশভিত্তিক সংখ্যায়ন পদ্ধতি যা বিশ্বে সব গণনার বর্ণমালা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শূন্যকে সংখ্যা হিসেবে ব্যবহারের নিয়মও ব্রহ্মগুপ্ত বলে দেন।কোনো সংখ্যায় শূন্য যোগ করলে বা বিয়োগ করলে সংখ্যাটি অপরিবর্তিত থাকে। কোনো সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে অসীম পাওয়া যায়।

জ্যোতির্বিদ্যা

ব্রহ্মগুপ্ত মহাভারতের উত্তর অংশে উজ্জয়িনী শহরে বাস করতেন, এবং তিনি তার শহরকে প্রাচীনকালের গ্রীনিচ করেছিলেন একে শূন্য দ্রাঘিমার সঙ্গে যুক্ত করে। ব্রহ্মগুপ্তর কাজ মধ্যপ্রাচ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল ও প্রভাব ফেলেছিল। যেখানে সূর্যের ও চন্দ্রের পরিক্রমা ও তাদের অবস্থানের বর্ণনা প্রতিদিনের ধর্মীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করত। ব্রহ্মগুপ্তর ব্রহ্মকূট সিদ্ধান্তে গ্রহের অবস্থান ও আবর্তনের গাণিতিক প্রমাণ, এমনকি সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধের গাণিতিক প্রমাণ রয়েছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞান

ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত রচনা এবং বিখ্যাত ভারতীয় চিকিৎসক যেমন চরক, শুশ্রুত ও মাধবকরের মতামত বিশ্বের চিকিৎসক মহলের ওপর জোরালো প্রভাব ফেলেছিল।

ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে এ সব জ্ঞানের ভাণ্ডার ও মতবিনিময়ে বিশ্বের বিদ্বান ও চিন্তাশীলদের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছিল। উমা

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলির (১৯৫৬) ৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হল

১। প্রকাশস্থান : বি ডি ৪৯৪, সল্ট লেক, কলকাতা - ৭০০০৬৪

২। প্রকাশকাল : ত্রৈমাসিক

৩। প্রকাশক : বরুণ ভট্টাচার্য্য

৪। মুদ্রক : নিউ জয়কালী প্রেস

৫। মুদ্রণস্থান : দীনবন্ধু লেন, কলকাতা-৭০০০০৬।

৬। সম্পাদক : সমীরকুমার ঘোষ, ৫২/৫১, শশীভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন, কলকাতা- ৭০০০৩৬।

আমি বরুণ ভট্টাচার্য্য এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

১ মার্চ, ২০২৫ বরুণ ভট্টাচার্য্য
প্রকাশক

বাংলায় নাস্তিকতা চর্চার জোয়ার

প্রতাপচন্দ্র দাস

পশ্চিমবঙ্গের বুকে যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা এবং নাস্তিকতার চর্চা এখন আর ছায়ায় ঢাকা কোনো গোপন বিষয় নয়; বরং তা এক প্রবল আন্দোলনের রূপ নিচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে ধারণ করেও ভারতীয় সমাজে নাস্তিকতা বরাবরই বিতর্কিত ছিল, কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমবঙ্গে এর প্রসার এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। ব্যক্তি পর্যায়ের বিশ্বাসের গণ্ডি পেরিয়ে, নাস্তিকতা আজ দলগতভাবে চর্চিত হচ্ছে—সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে পথসভা, বইপাঠ থেকে যুক্তিবাদী সংগঠনের কার্যক্রম, সব জায়গায় যুক্তির আলো ছড়িয়ে পড়ছে। ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বাংলার তরুণ সমাজ আরও দৃঢ় কণ্ঠে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরছে, যা এক সময় কেবল কিছু বিচ্ছিন্ন কণ্ঠে সীমাবদ্ধ ছিল। এই নবজাগরণ বাংলার ইতিহাসে যুক্তিবাদ ও মুক্তচিন্তার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছে।

তবে নাস্তিকতা বাংলার নতুন কোনো ধারণা নয়। ভারতীয় উপমহাদেশে চার্বাক দর্শন নাস্তিকতার ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল বহু শতাব্দী আগে।মধ্যযুগে বৌদ্ধ ও লোকায়ত চিন্তাধারাও ধর্মীয় কর্তৃত্ববাদকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। উনবিংশ শতকের বাংলায় বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্তের মতো মনীষীরা ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। বাংলায় নাস্তিকতা ও যুক্তিবাদী চিন্তার বিকাশের পেছনে লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর মুক্তচিন্তা ও যুক্তিবাদী দর্শনের আলোকে গড়ে ওঠা 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলন ব্রাহ্মণ্যবাদী কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল। ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের মধ্যে যুক্তিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বিজ্ঞানমনস্কতা প্রচার করতেন এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় যুক্তিবাদ ও নাস্তিকতার উজ্জ্বল ধারা থাকলেও, বিশ শতকে নানা সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে তা দুর্বল হয়ে পড়ে। একবিংশ শতাব্দীতে এই চর্চা আবার শুরু হয়। কিন্তু সাম্প্রতিককালে নাস্তিকতা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তরুণ প্রজন্ম যুক্তিবাদী বিতর্কে অংশ নিচ্ছে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে এবং ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে আরও স্পষ্টভাবে নিজেদের অবস্থান প্রকাশ করছে।

নবদ্বীপে 'নাস্তিক ভিলা'সহ বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে যুক্তিবাদী ও নাস্তিক চর্চার কেন্দ্র গড়ে উঠছে। নবদ্বীপের 'নাস্তিক ভিলা'য় 'বিপ্লবী ভগৎ সিং পাঠাগার' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে নিয়মিত আলোচনা, পাঠচক্র এবং সমাজতান্ত্রিক ও বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাধারার প্রচার হয়। পশ্চিমবঙ্গের বুকে গড়ে উঠেছে 'নাস্তিক মঞ্চ' একটি সংগঠন। এই সংগঠন পশ্চিমবঙ্গে প্রথম নাস্তিকদের নিয়ে রাজ্য সম্মেলন করে। তারপর নদিয়া এবং উত্তর ২৪ পরগণায় জেলা সম্মেলন করে বাংলার বুকে নাস্তিকতার চর্চা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

নাস্তিকতার প্রতি বাংলার মানুষের এই আগ্রহের পেছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিস্তারের ফলে যুক্তিবাদী আলোচনা সহজলভ্য হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ও অন্ধবিশ্বাস সমাজকে পিছিয়ে দিচ্ছে। ফলে তরুণ প্রজন্ম যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গির দিকে ঝুঁকছে। তৃতীয়ত, শিক্ষার প্রসার—বাংলার মানুষ শিক্ষা ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারার প্রতি আগ্রহী। বিজ্ঞান ও ইতিহাস শিক্ষার ফলে নাস্তিকতা নিয়ে চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে। চতুর্থত, রাষ্ট্রীয় ধর্মীয় মেরুকরণ — রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধর্মীয় রাজনীতির উত্থানও নাস্তিক চর্চার প্রবাহকে বাড়িয়েছে। বাংলার বহু নাস্তিককেই এখনো পরিবার ও সমাজের চাপে লুকিয়ে থাকতে হয়। কিছু ধর্মীয় সংগঠন ও রাজনৈতিক দল নাস্তিকদের 'নৈতিকতা ও মূল্যবোধহীন' বলে আখ্যা দিতে চায়। কিন্তু নৈতিকতা ধর্মের দান নয়, বরং তা মানবিকতা। বিজ্ঞান, যুক্তি এবং মুক্তচিন্তার প্রসারই পারে একটি প্রগতিশীল সমাজ তৈরি করতে। নাস্তিকতাকে শুধুমাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্বে আটকে না রেখে, এটিকে এক নতুন সামাজিক আন্দোলন হিসেবে দেখা উচিত। শুধু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আটকে না রেখে সাংগঠনিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই নাস্তিক জোয়ার যদি অব্যাহত থাকে তাহলে ভবিষ্যতে আরও বেশি মুক্তচিন্তা, বিজ্ঞানমনস্কতা এবং মানবিক সমাজের দিকে আমরা এগিয়ে যেতে পারব। উমা

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া পত্রিকার কোনও অংশের কোনও মাধ্যমের সাহায্যে কোনওরকম পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। — সম্পাদকমণ্ডলী

উৎস মানুষ WB/EC 228 ISSN 0971-5800 RN. 37375/80 Rs. 30.00
৪৬ তম বর্ষ ২য় সংখ্যা এপ্রিল-জুন ২০২৫ ৩০.০০ টাকা

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশনার বইয়ের জন্য যোগাযোগ— সুমন্ত বিশ্বাস।
ফোন— ৯৪৩৩৭৭১৫৭৭/৯৪৩৩০৩৬৫৩৩

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশনার বইগুলি অনলাইনে অর্ডার দিলে পাওয়া যায়। যোগাযোগ—হারিত বুকস (অনলাইন) **haritbooks@gmail.com**
হারিতের ফোন নং — +৯১ ৮৩৩৬৯৪১১০৮

বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা বাবদ ২৫০ টাকা পত্রিকার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে।
Punjab National Bank,
College Street Branch,
Kolkata - 700073.
UTSA MANUSH, SB ACCOUNT NO. 0083010748838. IFSC NO. PUNB0008320

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিয়ে ফোনে বা ই-মেলে নাম, ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নং ও ই-মেল দেবেন আর কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হবেন তা জানাবেন। ডাকে পত্রিকা না পেলে আমরা সংখ্যাটি দ্বিতীয়বার পাঠাতে পারব না। গ্রাহক নবীকরণ একইভাবে করা করা হয়।

ওয়েবসাইট : **https://www.utsomanush.com**
ই-মেল : **utsamanush1980@gmail.com**
Facebook : https://www.facebook.com/

পুস্তক তালিকা

জল-জমি-জঙ্গলের খোঁজে:	
বোলান গঙ্গোপাধ্যায়	১৫০.০০
স্বাস্থ্যের সাতকাহন ১ম খণ্ড : গৌতম মিস্ত্রী	২০০.০০
আসুন কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি: আশীষ লাহিড়ী	৮০.০০
চেনা বিষয় অচেনা জগৎ: সমীরকুমার ঘোষ	১৫০.০০
বাঁধ বন্যা বিপর্যয় (সংকলন)	২০০.০০
আহরণ (সংকলন)	২০০.০০
যে গল্পের শেষ নেই: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১৫০.০০
প্রতিরোধ : সম্পা: (ঐ)	১৩০.০০
বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (সংকলন)	২০০.০০
বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ (সংকলন)	১৫০.০০
বিবেকানন্দ অন্য চোখে/সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক	
নিরঞ্জন ধর	১২০.০০
প্রমিথিউসের পথে (সংকলন)	৫০.০০
লেখালিখি: অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	২০০.০০
যুক্তিবাদের চার সেনাপতি	
অনু : প্রতুল মুখোপাধ্যায়	৬০.০০
শেকল ভাঙা সংস্কৃতি (সংকলন)	১২০.০০
গুমোট ভাঙ্গার গান: ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ	১৫০.০০
নিজের মুখোমুখি: রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৫০.০০
এটা কী ওটা কেন (সংকলন)	৫০.০০
মূল্যবোধ (সংকলন)	৮০.০০
প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ:	
অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০.০০
বাংলা বন্ধ বা শেষের শুরু:	
হিমানীশ গোস্বামী	৪০.০০

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম, সেতু প্রকাশনী, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), ক্রান্তিক (কলেজ স্ট্রীট), রথীনদা (গোলপার্ক). ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (সূর্য সেন স্ট্রীট)। জ্ঞান বিচিত্রা ১৮বি/১বি, টেমার লেন। প্রতিক্ষণ, ৫ সূর্য সেন স্ট্রীট।
হারিত বুকস (অনলাইন) **haritbooks@gmail.com**

উৎস মানুষ সোসাইটির পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং দি নিউ জয়কালী প্রেস, ৮এ, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ হইতে মুদ্রিত।